হারানো মাণিক

শ্রীমনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তী

মূল্য বারো আনা

সূচীপত্র

হারানো মাণিক

—১—

সত্যবাবু দেশে চলেছেন—সঙ্গে মাতৃহারা চার বছরের শিশুপুত্র মণ্টু আর চিরসঙ্গী বিশ্বস্ত প্রৌঢ় চাকর 'শিবুকাকা'। বছর দুই হল মণ্টুর মা মণ্টুকে শিবুকাকার হাতে তুলে দিয়ে, স্বামীর পদধূলি মাথায় নিয়ে স্বর্গে চ'লে গেছেন। শিবুও 'দাদুভাই'কে মায়ের অধিক স্নেহেই আগলে আছে।

একখানি সেকেণ্ড ক্লাস কামরায় তিনটিমাত্র যাত্রী। তৃতীয় যাত্রীটি একটি পশ্চিমা যুবক—সুন্দর বলিষ্ঠ চেহারা, পরিপাটি বেশভূষা, ব্যবহার অমায়িক, মধুর। অল্প সময়ের মধ্যেই মণ্টুর সাথে

সে ভাব ক'রে ফেলেছে! সত্যবাবু অনেকটা নিশ্চিন্ত। গাড়ী থামলে শিবু মাঝে মাঝে এসে দুইভাইয়ের খবরাখবর ক'রে যায়—আর ঐ ফাঁকেই মণ্টুর গুণগ্রাহী বন্ধুটির কাছে সোৎসাহে দাদুর গুণপনা ও বুদ্ধিমত্তার বর্ণনা করে।

শেষরাত্রের দিকে গাড়ী এসে বর্দ্ধমানে থামল। মণ্টু ঘুমিয়ে পড়েছিল—সত্যবাবু গাড়ীর ঝাঁকুনিতে জেগে উঠে প্লাটফর্ম্মে নেমে পড়লেন। পশ্চিমা যুবকটি ঠায় জেগে ব'সে। সমস্ত গাড়ীখানাই তখন প্রায় ঘুমন্তপুরীর মত মনে হচ্ছিল। দু'দশজন যাত্রী উঠানামা দৌড়াদৌড়ি করছিল—আর সেই শেষরাত্রেও 'বর্দ্ধমানের সীতাভোগ' 'চা গরম' প্রভৃতি ফেরিওয়ালার দল নানা সুরে প্লাটফর্ম্ম মুখরিত ক'রে রেখেছিল।

এই বর্দ্ধমানেই মণ্টুর মা শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। পায়চারি করিতে করিতে সত্যবাবুর মনে সেইসব কথাই বার বার জাগছিল—অজ্ঞাতে চোখের কোণে অশ্রু জমে উঠছিল! গাড়ী

ছাড়বার প্রথম ঘণ্টা কানে যেতেই তাঁর সেই তন্ময়তা গেল ভেঙ্গে—ধীরে ধীরে গিয়ে তিনি গাড়ীতে উঠলেন। গাড়ীতে উঠেই তাঁর চক্ষু স্থির! একি, মণ্টুর শয্যা যে শূন্য! সেই যুবকটিও তো গাড়ীতে নেই! তবে কি ওরা দু'জনে প্লাটফর্ম্মে নেমে এদিক ওদিক বেড়াচ্ছে?

সত্যবাবু পাগলের মত প্লাটফর্ম্মের একদিক থেকে অন্যদিক পর্য্যন্ত 'মণ্টু মণ্টু' ব'লে ছুটে বেড়ালেন। কোন সাড়া পেলেন না—কারও দেখা পেলেন না। আবার ছুটে গেলেন শিবুর কামরার কাছে—কৈ? এখানেও তো আসে নি! গাড়ী ছাড়বার দ্বিতীয় ঘণ্টাও পড়ল—তবু মণ্টুর দেখা নেই। ওদিকে গার্ড সাহেব নীল আলো দেখিয়ে 'লাইন ক্লিয়ার' দিচ্ছিলেন; সত্যবাবু ছুটে তাঁর কাছে উপস্থিত হলেন—নিজের বিপদের কথা তাঁকে সমস্ত জানালেন।

সেকেণ্ড ক্লাসের যাত্রীর অনুরোধ—গার্ড সাহেব এড়াতে পারলেন না। লাল আলো দেখিয়ে গাড়ী

ছাড়া বন্ধ ক'রে দিয়ে রেলওয়ে পুলিশে খবর দিলেন।

সমস্ত গাড়ী খোঁজা হল—আশে-পাশে চারদিকে পুলিশের লোক ছুটল তদন্তে—কিন্তু কোনই ফল হল না। শিবু এ সংবাদে প্লাটফর্ম্মে লুটিয়ে প'ড়ে শিশুর মত কাঁদতে লাগল।

অনেকেই বললে যে, এ ছেলেধরার কাজ ছাড়া আর কিছু নয়—আর ঐ যুবকটি ঐ দলেরই লোক। পরে অনুসন্ধানে আরও দেখা গেল যে, সত্যবাবুর স্যুটকেশ থেকে পাঁচশ টাকার নোটও উধাও হয়ে গেছে। পরবর্ত্তী ট্রেনেই সত্যবাবু আবার কার্য্যস্থলে ফিরে গেলেন—বাড়ী যাওয়ার সমস্ত উৎসাহ-আনন্দ তাঁর নিঃশেষ হয়ে গেছে!

—২—

বর্ম্মা মুল্লুকের একটি ছোট্ট সহরের একটা রঙ্গমঞ্চে আজ ক'দিন ধরে দারুণ ভীড়—বিখ্যাত ম্যাজিসিয়ান্ মিঃ সরকার তাঁর 'ভূতুড়ে বাক্সের' খেলা

দেখিয়ে সারা সহরকে চমক লাগিয়ে দিয়েছেন। একটা জলজ্যান্ত লোককে সকলের সামনে বাক্সের ভিতর পূরে অদৃশ্য করিয়ে, ক্ষণপরেই তাকে সশরীরে ফিরিয়ে আনা—এ কম ক্ষমতার কাজ নয়।

মিঃ সরকারের বাড়ীর পাশেই একটি কাঠের গোলা—মালিক একজন বাঙ্গালী হিন্দু—নাম রামলাল। সরকারের ঘরের জানালা থেকে গোলার উঠোনের একটা অংশ বেশ চোখে পড়ে। সন্ধ্যার পর থেকে রাতদুপুর পর্য্যন্ত প্রায় প্রতিদিনই সেখানে চলে হল্লা, মাতামাতি। সেই কদর্য্যতার মধ্যে সব চেয়ে অস্বাভাবিক ঠেকত একটি দশ-এগারো বছরের ফুটফুটে সুন্দর ছেলের উপস্থিতি। পরণে তার শতচ্ছিন্ন বসন—তেলের ও যত্নের অভাবে মাথার চুল বিবর্ণ বিশৃঙ্খল, শীর্ণদেহে খড়ি উড়ছে—তবু চোখেমুখে এমনি একটা কমনীয়তা ফুটে আছে—যা ঐ জঘন্য পারিপার্শ্বিকতা থেকে তাকে আলাদা ক'রে রেখেছে।

এতদিন কৌতূহল দমন করতে না পেরে মিঃ সরকার ঐ ছেলেটিকে ইঙ্গিতে নিজের জানালার

নীচে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"খোকা,
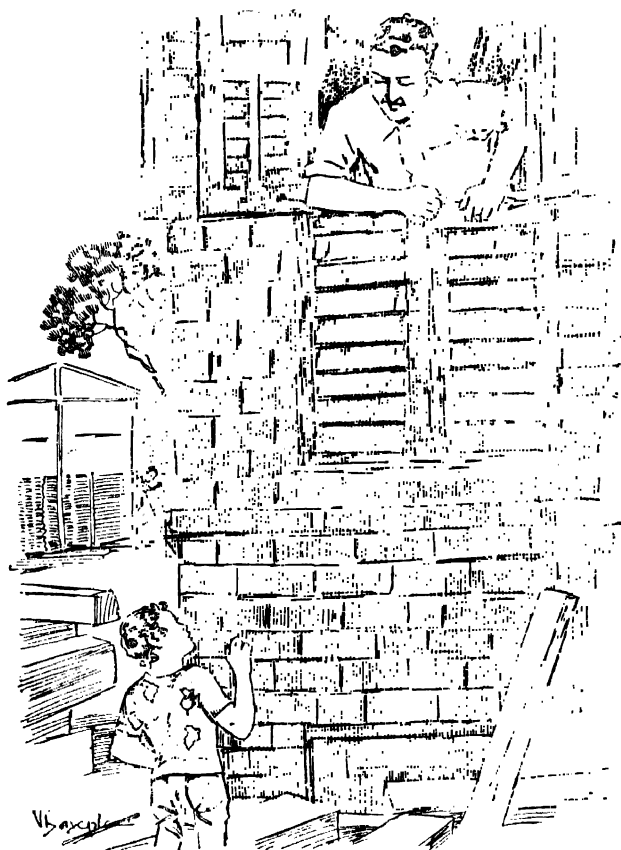
নামটি কি তোমার? এরা তোমার কে? তোমার এ

অবস্থাই বা কেন ? তোমার কোন ভয় নেই। তুমি তোমার সমস্ত কথা আমায় খুলে বল তো !”

এই স্নেহভরা কথাগুলো শুনে ছেলেটি ঝর্‌ঝর্‌ ক’রে কেঁদে ফেললে। তারপর ধীরে ধীরে ভীরু চোখ দুটি তুলে অত্যন্ত করুণভাবে মিঃ সরকারের মুখের দিকে একবার চাইলে, পরে বললে—“বাবু, নাম আমার মণিলাল। এই গোলার মালিক আমার মনিব। এর বেশী তো জানি না। আমায় বিনাদোষে যখন তখন ধ’রে মারে, সমস্ত কাজকর্ম্ম আমাকে দিয়ে করিয়ে নেয়—অথচ দু’বেলা পেটভ’রে খেতেও দেয় না ; কারও সাথে মিশতে দেয় না—এমন কি বাইরে বেরিয়ে যাবার সময় সদর দরজায় তালাবন্ধ ক’রে যায়—পাছে আমি পালিয়ে যাই। বাবু, আপনি দয়া ক’রে এদের হাত থেকে আমায় উদ্ধার করুন—নইলে আমি বাঁচব না !”
—এই ব’লে ছেলেটি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

মিঃ সরকারের চোখের পাতাও ভিজে গেল—

তিনি তাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন—"তুমি নিশ্চিন্ত থাক, তোমায় আমি উদ্ধার করবই।"

কয়েকদিন পরই এক বন্ধু বললেন—"দেখুন মিঃ সরকার, আপনার খেলাটা আরও ইণ্টারেষ্টিং হতে পারে, যদি অডিটোরিয়াম থেকে কাউকে নিয়ে অদৃশ্য করতে পারেন।"

কথাটা মিঃ সরকারের খুব মনে লাগল—তাঁর মুখখানা সহসা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি সেই প্রস্তাবের মধ্যে ঐ ছেলেটির উদ্ধারের উপায় দেখতে পেলেন। তখনি বাড়ী ফিরে গিয়ে মনে মনে একটা প্ল্যান ঠিক ক'রে ফেললেন।

দু'তিন দিনের মধ্যেই রামলালের সাথে মিঃ সরকার খুব খাতির জমিয়ে ফেললেন, কয়েক দিন বিনা পয়সায় ম্যাজিকও দেখিয়ে দিলেন। একদিন সুযোগ বুঝে বললেন—"দেখ রামলাল, তোমার মত চমৎকার একজন প্রতিবেশী পেয়ে বর্ম্মার দিনগুলো খুবই আমোদে কাটান গেল। কালকেই তো শেষ খেলা। ইচ্ছে ছিল যাবার সময় বর্ম্মা মুল্লুকটাকে

তাক্ লাগিয়ে যাব—খেলায় আর একটু নূতনত্ব ক'রে। তা ভাই, তুমি যদি একটু সহায়তা কর তবে,—অবশ্য তোমারও তাতে কিছু লাভ হবে। কাজের জন্য তোমাকে নগদ পঞ্চাশ টাকা দিতে রাজী আছি—আগাম চাও, তাও দিতে পারি!"

এক রাত্রের জন্য নগদ আগাম পঞ্চাশ টাকা! রামলাল তৎক্ষণাৎ রাজী হল। তাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিয়ে মিঃ সরকার বাড়ী গিয়ে সহকারীকে প্ল্যানটা খুলে বললেন। ব্যবস্থা ঠিক ক'রে দুপুর-বেলা মণিকে ডেকে দু'তিন বার বেশ ক'রে সব বুঝিয়ে বললেন।

কৃতজ্ঞতায় মণির হৃদয় ভ'রে গেল—সে মনে মনে এই নর-দেবতার চরণে কোটি প্রণিপাত করলে।

—৩—

আজ 'শেষ রজনী'। নূতন কিছু দেখবার আশায় অডিটোরিয়াম আজ লোকে লোকারণ্য—বর্ম্মি-বর্ম্মিণীদের নানা রংয়ের রেশমী পোষাকের

সৌন্দর্য্যে প্রেক্ষাগৃহে যেন প্রজাপতির মেলা ব'সে গেছে!

যথাসময়ে তুমুল আনন্দধ্বনির মধ্যে ম্যাজিসিয়ান্ এসে মঞ্চের সম্মুখে দাঁড়ালেন। পরে সমবেত জনতাকে অভিবাদন ক'রে বললেন—"আমার শেষ রজনীর আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা আপনারা গ্রহণ করুন। আজ বিদায়ের দিনে যাতে কারও মনে কিছুমাত্র সন্দেহের অবকাশ না থাকে সেইজন্য নিবেদন করছি, আপনাদের যে কেহ একজন আসুন—তাঁকে দিয়েই আজ ভূতুড়ে বাক্সের খেলা দেখাব।"

কথা শেষ হওয়ার সাথে সাথেই রামলাল মণিকে নিয়ে মঞ্চের দিকে এগিয়ে গেল। মণির চেহারা আজ বদলেছে—চুলে তেল পড়েছে, গায়ে পরিষ্কার জামা-কাপড় উঠেছে।

ম্যাজিসিয়ান্ এগিয়ে এসে মণিকে মঞ্চের উপর তুলে নিলেন। খেলা আরম্ভ হল। মণিকে বাক্সের ভিতর পূরে ডালা বন্ধ ক'রে যাদুকর তার উপর কয়েকবার যাদুদণ্ডটা ঘুরিয়ে—ডালাটা খুলতে

লাগলেন। সমবেত দর্শকগণ রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগল। ডালা খুললে দেখা গেল সত্যিই বাক্স শূন্য! তুমুল হাততালির শব্দ উঠল।

এইবার ঐ অদৃশ্য মূর্ত্তির পুনরাবির্ভাবের পালা—চরম উত্তেজনার সময়! মঞ্চের পেছনের পর্দ্দার উপরেও কয়েকবার যাদুদণ্ড ঘুরিয়ে ম্যাজিসিয়ান্ পর্দ্দাটা তুলে ধরলেন—সমগ্র জনতার দৃষ্টি তখন ঐ পর্দ্দার উপর কেন্দ্রীভূত। কিন্তু একি! রোজকার মত পর্দ্দার পেছনে তো কেউ নেই! রামলালের চক্ষু স্থির! পর পর তিনবার চেষ্টা ক'রেও ম্যাজিসিয়ান্ ব্যর্থ হলেন—তখন তুমুল হৈ-চৈএর মধ্যে যবনিকা ফেলে দেওয়া হল।

রামলাল তো রেগে খুন—তার ছোকরাকে এখনি ফিরিয়ে দিতেই হবে। অনেক খোঁজাখুঁজি ক'রেও কিন্তু মণিকে পাওয়া গেল না। পুলিশে খবর দেওয়ার প্রস্তাব করতেই, রামলাল ধীরে ধীরে সেখান থেকে স'রে পড়ল।

ওদিকে বাক্সের ভিতর ঢুকে নির্দ্দিষ্ট জায়গায়

চাপ দিতেই নীচের ডালাটা আস্তে আস্তে স'রে গেল —মঞ্চের নীচে একটা ছোট সিঁড়ি দেখা গেল। মণি ঐ সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমেই একেবারে রাস্তায় গিয়ে উপস্থিত। মোড়েই তার জন্য একখানা মোটর নিয়ে মিঃ সরকারের সহকারী অপেক্ষা করছিলেন— মণি উঠতেই গাড়ী তীব্রবেগে রাত্রির অন্ধকার ভেদ ক'রে সমুদ্রতীরের দিকে ছুটে চলল।

ভোরের আব্ছা অন্ধকারে তারা মালপত্র নিয়ে জাহাজে উঠল। মণির আজ কি আনন্দ—আজ সে মুক্ত! খানিক পরেই মিঃ সরকার তাদের সাথে এসে যোগ দিলেন।

মণি মিঃ সরকারের পায়ের উপর উবু হয়ে প'ড়ে অশ্রুজলে তাঁর পা দুখানি ভিজিয়ে দিল। অন্য দু'জনের চোখও তখন শুষ্ক ছিল না।

—৪—

সত্যবাবু এখন চাকরী ছেড়ে, শিবুকে নিয়ে, শোভাবাজার গঙ্গার ধারেই ছোট্ট একখানি একতালা

বাড়ীতে বাস করেন। রাতদিন পূজা-অর্চ্চনা, ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ, এসব নিয়েই থাকেন—সন্ধ্যায় মদনমোহনতলায় আরতি দেখতে যান। প্রভু-ভৃত্যের এই দৈনন্দিন কার্য্যধারা।

মাঝে মাঝে যখন মণ্টুর কথা মনে পড়ে—বুকটা খাঁ-খাঁ ক'রে উঠে, তখনই সত্যবাবু গীতা খুলে বসেন, মনকে ফেরাবার জন্য।

একদিন চিৎপুরের মোড়ে একজন সাহেবী পোষাক-পরা ভদ্রলোক হঠাৎ পেছন থেকে এসে সত্যবাবুকে জড়িয়ে ধ'রে ব'লে উঠলেন—"আরে, সত্য যে! কত বছর পরে তোর সাথে দেখা! শুনেছিলাম সপরিবারে পশ্চিমে চাকরী করিস্—এখন কি ছুটিতে নাকি? যাহোক এখন ওঠ্ আমার গাড়ীতে। ওজর-আপত্তি শুনব না। স্কুলের ছেলেরা 'মাণিকযোড়' ব'লে আমাদের কত ঠাট্টা করত। বহুদিন বাদে আজ আবার দুই মাণিক যোড় হয়েছি—এ কি ভাঙ্গা যায়?"—ব'লেই হোঃ-হোঃ শব্দে হেসে উঠলেন।

সত্যবাবু কাকুতি মিনতি ক'রে বললেন—"না ভাই সরোজ, আজ ছেড়ে দে—আর একদিন যাব। শিবুকাকা আমার জন্য ব'সে আছে—এখন সে-ই তো আমার সংসারের শেষ সম্বল। আর সবাই একে একে ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছে।" কথার শেষ দিকটায় তাঁর গলাটা ধ'রে এল।

সরোজবাবু ব্যথিত হলেন, বললেন—"চল্ শিবুকাকাকেও গাড়ীতে তুলে নিয়ে যাব।"

—৫—

বেলা দশটার সময় সরোজ সরকারের মোটর গিয়ে তাঁর ভবানীপুরের বাড়ীর সামনে থামল। সত্যবাবুকে নিয়ে ড্রয়িংরুমে পা দিতেই একটি অতি সুন্দর কুড়ি-একুশ বছরের যুবক ভিতরের দরজা দিয়ে সেই ঘরে ঢুকল।

সরোজবাবু ওরফে মিঃ সরকার বললেন—"মনোজ, ইনি তোমার কাকা হন, প্রণাম কর।"

সত্যবাবু ততক্ষণ বিস্ফারিতনেত্রে মনোজের

মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। তাঁর মনে হচ্ছিল তিনি বুঝি স্বপ্ন দেখছেন। নইলে মণ্টুর মা'র সেই নাক, সেই চোখ, সেই ওষ্ঠাধর হুবহু ঐ যুবকের মুখে প্রতিফলিত হল কেমন ক'রে!

মনোজ হেঁট হয়ে সত্যবাবুর পদধূলি নিয়ে উঠে দাঁড়াতেই তিনি তাকে বুকে চেপে ধরলেন—অজ্ঞাতে তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল—"মণ্টু!" পরমুহূর্ত্তেই সরোজকে জিজ্ঞাসা করলেন—"এ ছেলেটি কে সরোজ?"

সরোজবাবু বললেন—"বর্ম্মা মুল্লুকে খেলা দেখাতে গিয়ে এক শিকারের হাত থেকে একে উদ্ধার ক'রে নিয়ে এসে নিজের ছেলের মতই পালন করেছি—এই ওর পরিচয়! পূর্ব্বপরিচয় তো ভাই বলতে পারব না—ও নিজেও জানে না। বড় ভাল ছেলে।"

বর্ম্মার ব্যাপারের সমগ্র ইতিহাসটা সরোজবাবু সত্যবাবুকে শোনালেন।

সত্যবাবুর হৃৎস্পন্দন দ্রুততর হল। তিনি

সাগ্রহে মনোজকে বললেন—"বাবা, তোমার বাম পায়ের নীচে কি একটা জড়ুল-চিহ্ন আছে ?"

মনোজ পায়ের তলাটা তুলে ধরতেই সকলে সবিস্ময়ে দেখলেন—সত্যই তো পায়ের তলায় জড়ুল-চিহ্ন !

সত্যবাবু আনন্দে আত্মহারা হয়ে মনোজকে সজোরে বুকে চেপে ধ'রে চীৎকার ক'রে উঠলেন—"শিবুকাকা, শিবুকাকা, পেয়েছি ! এতদিনে

আমাদের হারানো মাণিক ফিরে পেয়েছি। তোমার বড় আদরের মণ্টুকে ফিরে পেয়েছি—ছুটে এস, শীগ্‌গির ছুটে এস!"—আবেশে তাঁর চোখ দুটো বুজে এল—আর তারই দু'কূল ছেপে, অজস্র আশার্ব্বাদী ফুলের মত মণ্টুর মাথায় ঝ'রে পড়তে লাগল অশ্রুর পর অশ্রুর বিন্দু! মণ্টুও পিতৃপরিচয়ের আনন্দে, অশ্রুজলে সত্যবাবুর বুক ভাসিয়ে দিল।

সত্যবাবুর কথাগুলো কানে যেতেই শিবু যথাসম্ভব দ্রুতপদে সেখানে এসে উপস্থিত হয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—"কই, কই, আমার দাদুভাইটি কই রে!"

মনোজ বাপের আলিঙ্গনমুক্ত হয়ে শিবুর দিকে এগিয়ে যেতে শিবুও তাকে বুকের ভিতর টেনে নিয়ে মাথায়, মুখে, পিঠে, বুকে হাত বুলোতে বুলোতে বলতে লাগল—"দাদুভাই, এতদিন কেমন ক'রে ভুলেছিলি ভাই?" বলতে বলতে সঙ্গে সঙ্গেই সে হু-হু ক'রে কেঁদে ফেলল।

সত্যবাবু তখন সরোজবাবুকে ছেলেচুরির ইতিহাস খুলে বললেন। এই অপ্রত্যাশিত মিলনে সরোজবাবুর গৃহে আনন্দের স্রোত বয়ে গেল।

... ...

সত্যবাবু ও সরোজবাবু এখন এক বাড়ীতেই বাস করেন। মণ্টু সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ছে—তিনজনের অশ্রান্ত স্নেহধারায় অভিষিক্ত হয়ে তার দিনগুলো খুবই আরামে কাটছে। শিবুদা'র কাছে শুনে শুনে মায়ের যে মূর্ত্তি সে কল্পনা করেছে—প্রতি রাত্রে ঘুমোবার পূর্ব্বে মণ্টু অতি সঙ্গোপনে সেই মাতৃমূর্ত্তির পাদমূলে অশ্রুর অঞ্জলি উপহার দেয়!

শিবু এখনও সেই ভূতুড়ে বাক্সটিকে পরমযত্নে ঠাকুরদেবতার মতই পূজো করে! জিজ্ঞাসা করলে বলে—"এই বাক্সের দৌলতেই তো দাদুভাইকে ফিরে পেয়েছি, একে পূজো করব না!" সঙ্গে সঙ্গে সে বাক্সের কাছে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করে।

বাঘ-শিকার

রায়বাবুদের বৈঠকখানায় সে-দিন সন্ধ্যায় বিরাট আড্ডা বসেছে। রোজই বসে—কিন্তু সেদিনের আলোচনার ধারাটা প্রতিদিনের মত পল্লী-রাজনীতির পথ ছাড়িয়ে অন্যদিকে বয়ে চলেছে। গত সপ্তাহে 'দি গ্রেট্ ট্র্যাভেলিং সার্কাস' যে অভূতপূর্ব্ব খেলা দেখিয়ে গেছে—তাকেই কেন্দ্র ক'রে সেদিনের সান্ধ্য মজলিস জমে উঠেছে।

এমন সময় এক হাতে একটা কালিপড়া ভাঙ্গা লণ্ঠন ও অন্য হাতে উত্তরাধিকার-সূত্রে পাওয়া বেতের লাঠিগাছা নিয়ে গজেনবাবু এসে দর্শন দিলেন। তুমুল কলরবে সকলে তাঁর অভ্যর্থনা করল।

এখানে গজেনবাবুর একটু পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। এক কথায় বলতে গেলে—তিনি গ্রামের 'গেজেট'। সম্ভব অসম্ভব নানাপ্রকারের নিত্য নূতন বিচিত্র সংবাদ সরবরাহ করাই তাঁর

চরিত্রের বিশেষত্ব! ক্রোশ দু’-তিন দূরে এক কাছারির নায়েব একখানি স্থানীয় বাংলা সংবাদপত্র রাখতেন—শুধু নিলাম ইস্তাহার দেখবার জন্য। সংবাদপত্রের অর্দ্ধাংশে নিলাম ইস্তাহার—অন্য অংশে বিজ্ঞাপন ও স্থানীয় দু’-চারটা সংবাদ থাকে। গজেনবাবু সেটিরই প্রথম পৃষ্ঠার প্রথম অক্ষর হতে শেষ পৃষ্ঠার শেষ অক্ষরটি পর্য্যন্ত গভীর মনোযোগের সাথে পাঠ করতেন—কাজেই তাঁর ভাণ্ডারে খবরের অভাব হওয়ার কথা নয়! এই কারণেই গ্রাম্য মজলিসে তাঁর একটা বিশিষ্ট স্থান ছিল।

গজেনবাবু লণ্ঠনটার আলো কমিয়ে, লাঠিটা বেড়ায় ঠেস্ দিয়ে রেখে, একেবারে ফরাসের মাঝখানে গিয়ে জাঁকিয়ে বসলেন—ঈষৎ অবজ্ঞাভরে সমবেত জনতার উপর একবার চক্ষু বুলিয়ে নিয়ে গম্ভীরমুখে রইলেন। সকলেই পূর্ব্বের আলোচনা ত্যাগ ক’রে তাঁর মুখপানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করল।

রায়মহাশয় জিজ্ঞাসা করলেন—“কিহে গজেন, আজকার নূতন খবর কি ?”

গজেনবাবু মুরুব্বীয়ানা চালে যা ব্যক্ত করলেন তা এই ঃ—সার্কাসের দল ছ' ক্রোশ দূরে আজিমগঞ্জে গিয়ে তাঁবু ফেলে। গতরাত্রেই চাকরটার অসাবধানতায় খাঁচার দরজা খোলা পেয়ে ব্যাঘ্রপ্রবর পরিপাটিরূপে গা-ঢাকা দিয়েছেন। খুব খোঁজাখুঁজি চলেছে—কিন্তু বিকাল পর্য্যন্তও তার সন্ধান পাওয়া যায় নি। সকলকে আশ্বস্ত করবার জন্য গজেনবাবু একথাও জানিয়ে দিলেন যে, ব্যাঘ্রের পায়ের দাগ উত্তরদিকেই গেছে—এই গাঁয়ের দিকে আসে নি। অতএব—"মাভৈঃ"।

গজেনবাবুর ভরসা পেয়েও কিন্তু সেদিনকার মজলিস আর জমল না। সকলেই একটা-না-একটা ছুতা ক'রে উঠে পড়লেন। সভা সেদিনকার মত ভেঙ্গে গেল।

গাঁয়ে এই বার্ত্তা রটতে দেরী হল না। সকলেই দু'-চার দিন ভয়ে ভয়েই কাটাল। চার দিনের পরও যখন ব্যাঘ্র মহাশয়ের সাক্ষাৎ মিলল না অথবা গজেনবাবুও ঐ বিষয়ে কোন নূতন কথা

বলতে পারলেন না, তখন লোকের দৃঢ় বিশ্বাস হল—বাঘ সত্যই উত্তরদিকে—হয়তো বা এতক্ষণে হিমালয়ের জঙ্গলেই গিয়ে, স্বজাতির দলে মিশে গেছে। কাজেই পুনরায় পূর্ব্বের স্বাভাবিক জীবনধারা ফিরে এল। আবার পূরাদমে মজলিস চলতে লাগল। ... ...

কয়েক দিন পরের কথা। সেদিনও আড্ডা খুব জমে উঠেছে।

হঠাৎ বাইরে একটা চীৎকার শোনা গেল—"ওরে বাবারে! খেলে রে!" পরমুহূর্ত্তেই রত্না ওরফে রতন নাপিত ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে ছুটতে হুড়মুড় ক'রে এসে ঘরে ঢুকল; ঢুকেই সজোরে দরজাটা বন্ধ ক'রে দিল—তারপর মাটিতে ব'সে প'ড়ে হাঁপাতে লাগল। সকলেই ভীতিপূর্ণ উৎসুক-কণ্ঠে জানতে চাইল—ব্যাপারটা কি?

রত্না একবার দম নিয়ে বলল—"বা—ঘ—একটু জ—ল—"

'বাঘ' শব্দটা শুনেই সকলের চক্ষু কপালে উঠল

—মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল ! যা হোক, জল খেয়ে একটু সুস্থ হয়ে রত্না জানাল যে, ঐ চণ্ডীতলার মাঠের ধারের অশ্বত্থগাছটা পার হতেই একটা প্রকাণ্ড কেঁদো বঘ তাকে তাড়া করেছিল—সে

সজোরে দরজাটা বন্ধ ক'রে দিল—

প্রাণপণে ছুটে এসে এখানে আশ্রয় নিয়েছে ! পূর্ব্বপুরুষদের বহু পুণ্যের ফলে এ যাত্রা সে বেঁচে গেছে ।

গজেনবাবুর অবস্থাই হল সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয় । একে তো তাঁর অমন একটা অভয়দান মাঠে মারা

গেল—তদুপরি বাড়ী তাঁর গ্রামের একপ্রান্তে—ঐ অশ্বত্থগাছের নীচ দিয়েই বাড়ী যাবার রাস্তা। এই রাত্রে একলা বাড়ী যাওয়ার কল্পনা করতেও তাঁর অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল। সকলেরই বাড়ীর জন্য দুশ্চিন্তা হল সর্ব্বাধিক—অথচ সেই ঘর হতে বের হয়ে বাইরে উঁকি দিয়ে দেখবারও সাহস কারও নেই!

অনেক গবেষণার পর গজেনবাবুরই প্রস্তাবমত স্থির হল—সকলেই সেই রাত্রের মত রায় মহাশয়ের অতিথি হবেন, পরদিন দিনের আলোতে যে যার বাড়ী ফিরে যাবেন।

গ্রামের অন্য কেউই আর সে রাত্রে ব্যাঘ্র মহাশয়ের শুভাগমনের সংবাদ পেল না; সুতরাং তারা নিশ্চিন্তে নিদ্রা গেল।

পরদিন এই সংবাদ সমস্ত গ্রামে ছড়িয়ে পড়ল। সকলেই আতঙ্কিত—কখন বাঘ এসে 'হালুম' ক'রে ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে। বাড়ীর বের হলে—ঘরে ফিরে না আসা পর্য্যন্ত নিশ্চিন্ত হবার উপায় নেই।

সন্ধ্যার পূর্ব্বেই সকল বাড়ীতে আলো নিবে যায় —দরজায় খিল পড়ে। সুবিধা যা সামান্য হল মাষ্টার ও ছাত্রদের—মাষ্টারেরা ছেলে-ঠেঙানর হাত হতে নিষ্কৃতি পেলেন—ছাত্রের দলও পিঠ এবং কানকে কয়েকদিনের বিশ্রাম দেবার সুযোগ পেল।

হরু জেলের অবস্থা জেলে-বস্তীর মধ্যে একটু সচ্ছল। বাড়ীতে টিনের ঘর আছে চার ভিটায় চারখানা। উত্তরদিকের বড় ঘরখানাতেই সে নিজে থাকে। তার ঘরের পেছনেই সামান্য একটু উঠোন; তারপরই একটা খড়ের বড় চালা—সেটা গোয়ালঘর। তার একপাশে একটা গরু থাকে বাছুরসহ—আর একধারে ছয়টা পাঁঠা ও দুইটা খাসি থাকে—মধ্যখান দিয়ে একটা বেড়া দ্বারা ভাগ করা। পূজো আসছে ব'লে অনেকেই দু'পয়সা রোজগারের আশায় এই সময় পাঁঠা খাসি 'ষ্টক্' করে। হরুও তাই করেছে।

সেদিন রাতদুপুরে একটা মড়্মড়্ শব্দে হরুর ঘুম ভেঙ্গে গেল—ধড়্ফড়্ ক'রে বিছানায় উঠে চুপ

ক'রে সে কানখাড়া ক'রে খানিক ব'সে রইল। মনে হল কেউ যেন গোয়ালঘরের বেড়া ভাঙ্গছে। অনেক সময় রাত বিরেতে নদীতে মাছ ধরতে হয়, তাই হরুর সাহস ছিল প্রচুর। সে আস্তে আস্তে
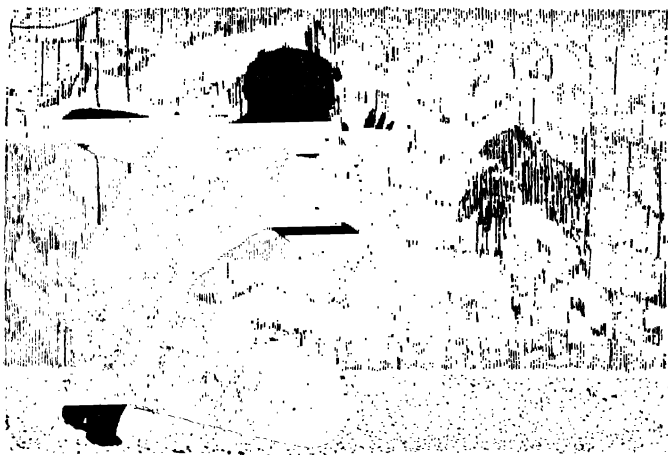
বিছানা হতে উঠে গিয়ে বেড়ার ফাঁকে চোখ রেখে ব'সে রইল। পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নায় বাইরে সবই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। হরু প্রথমে কিছু দেখতে পেল না—কেবল গোয়ালঘরের ভিতরে একটা হুটোপুটির শব্দ শুনল। খানিক পরে একটা পাঁঠার

ভ্যাঁ-ভ্যাঁ শব্দ হয়েই সব নীরব হয়ে গেল। পরমুহূর্ত্তেই ধপ্‌ ক'রে একটা আওয়াজ হল। হরু সভয়ে দেখল—একটা প্রকাণ্ড বাঘ একটা পাঁঠা থাবার মধ্যে ধ'রে গোয়ালঘরের ভাঙ্গা বেড়া দিয়ে বাইরে লাফিয়ে পড়ল।

বাঘের বিরাট বপু দেখেই হরু 'গোঁ-গোঁ' শব্দ করতে করতে সেইখানেই মূচ্ছিত হয়ে পড়ল।

হরুর গোঙানীর শব্দে তার স্ত্রী জেগে উঠল; স্বামীর অবস্থা দেখে সে সকলকে ডেকে তুলল।

সকলের সমবেত চেষ্টায় অল্পক্ষণেই মূর্চ্ছা ভাঙ্গল—চোখ মেলে চেয়েই হরু চতুর্দ্দিকে ভীতিপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে লাগল।

হরুর স্ত্রী ধীরে ধীরে তার গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বলল—"হাঁ গা, অমন ক'রে চারদিকে তাকাচ্ছ কেন? কি হয়েছিল বল দেখি।"

এইবার হরু জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে ধীরে ধীরে সমস্ত ঘটনা আগাগোড়া ব'লে গেল। শুনে সকলের তো চক্ষুস্থির!

প্রাতে এই নিদারুণ সংবাদ গ্রামে প্রচারিত হলে সকলে মাথায় হাত দিয়ে ব'সে পড়ল। ভাবল আজ পাঁঠা, কাল হয়তো গরু, এইরূপে ক্রমে মানুষও যে মান্যবর অতিথির খাদ্যতালিকাভুক্ত হবে না, তারই বা নিশ্চয়তা কি? একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার কিন্তু দেখা গেল—অনেক চেষ্টাতেও বাঘের পায়ের একটা দাগও ঘটনাস্থলে খুঁজে পাওয়া গেল না!

এই ঘটনার পর হতে প্রতি রাত্রেই ব্যাঘ্র মহাশয় গ্রামের কোন-না-কোন বাড়ী হতে একটি দুটি ক'রে পাঁঠা, হাঁস, মুরগী ফলারের জন্য গ্রহণ করতে লাগলেন। তবে সৌজন্য ও কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ গরু, মহিষ প্রভৃতির প্রতি বড় লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেন না—আতিথেয় মানবজাতির প্রতি বিশেষ নজর দিতেন না।

ক্রমে গ্রাম প্রায় খাদ্যোপযোগী চতুষ্পদ ও দ্বিপদ পশু-পক্ষী-শূন্য হয়ে এল। ক্রমে শুনা যেতে লাগল—প্রকাশ্য দিবালোকেও ব্যাঘ্র মহোদয়কে

ইতস্ততঃ দেখা যায়। সেদিন নাকি জব্বর ঘরামীকে রত্না নাপিতের বাড়ীর কাছেই চণ্ডীতলার মাঠ পার হবার সময় বাঘে তাড়া করেছিল—ঘরামীর পো দৌড়ে সুপারীগাছে উঠে সে-যাত্রা রক্ষা পায়। রত্না নাপিতও সেদিন বলছিল—মাহিগঞ্জের হাট হতে সে দুইটা পাঁঠা কিনে ফিরছিল, পথে মাঠের ধারে গজারি-বন হতে বাঘটা হঠাৎ গাঁক্ ক'রে একটা পাঁঠার উপর লাফিয়ে পড়ে। রত্না তো পাঁঠা ছেড়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়ে রাধু ধোপার বাড়ী গিয়ে উঠে। মোটকথা—ক্রমে লোকে আতঙ্কে যেখানে সেখানে, যখন তখন বাঘ দেখতে লাগল।

ব্যাপার চরমে উঠল সেইদিন—যেদিন সিধু বৈরাগী রায়েদের বৈঠকখানায় এসে কেঁদে পড়ল—"বাবু গো, আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে! আমার যথাসর্ব্বস্ব গেছে।"

কান্নার বেগ থামলে সে যা ব্যক্ত করলে তার মর্ম্মার্থ এই যে—ভিক্ষার পয়সা বাঁচিয়ে লাভের আশায় সে একটি পাঁঠা কিনে সেটিকে খাইয়ে

দাইয়ে বেশ নধর ক'রে তুলেছিল; গত রাত্রে ব্যাঘ্র মহাশয় সেটির সদ্ব্যবহার করেছেন।

তখনই মিটিং বসল—স্থির হল বাঘটাকে শিকার করতেই হবে। দু-এক জন জানাল তারা দিনের বেলা গজারি-বনে বাঘকে ঘুমিয়ে থাকতে দেখেছে!

ঠিক হল—দিনের বেলাই শিকারে বেরুতে হবে। সমস্ত ব্যবস্থা হল। জমিদার-বাড়ীর প্রফুল্লের শিকারী ব'লে নাম আছে। সে বন্দুক নিয়ে অগ্রসর হল। অন্য সকলে নিতান্ত অনিচ্ছায়—কেবল জমিদারের ভয়ে—কেউ লাঠি, কেউ শড়কী, কেউ বা কাস্তে হাতেই পেছন পেছন চলল।

সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ক্ষুদ্র গজারি-বনের ভিতর দাপাদাপি ক'রেও ব্যাঘ্রের দর্শন মিলল না। সন্ধ্যার পর পরিশ্রান্ত শিকারীর দল বিজয়ী বীরের মত রায়-বাড়ীর বৈঠকখানায় ব'সে বিশ্রাম করছিল এবং সেদিনের অসমসাহসিক অভিনয়ের আলোচনায় ঘরখানা মুখর ক'রে রেখেছিল। সভা বেশ

জমে উঠেছে—এমন সময় বুড়ো শিবু জেলে লাঠি ঠক্‌ঠক্‌ করতে করতে সেখানে উপস্থিত হয়েই প্রফুল্লকে বলল—"খোকাবাবু, বাঘ শিকারে গিয়ে নাকি নিরাশ হয়ে ফিরে এসেছ? সত্যি বাঘ শিকার করবে? আমি তোমাদের বাঘের খোঁজ ব'লে দিতে পারি।"

সকলে ছদ্ম উৎসাহে ব'লে উঠল—"কোথায়? কোথায়?"

শিবু উত্তর করল—"রতন নাপিতের গোয়ালে ঢুকেছে দেখে এলাম। শিকার করতে চাও তো শীগ্‌গির যাও।"

সকলে রত্নার বাড়ীর দিকে চলল। কিছুদূরে থাকতেই প্রফুল্লের আদেশে সকলে নিঃশব্দে পা টিপে টিপে যেয়ে রত্নার গোয়ালঘরের পেছনে দাঁড়াল। প্রফুল্ল সবিস্ময়ে দেখল—রত্নার খড়ো ভাঙ্গা গোয়াল আর নেই, তার জায়গায় দিব্য পোক্ত টিনের গোয়াল হয়েছে। গ্রামের এক প্রান্তে অবস্থিত ব'লে সাধারণতঃই এইদিকে

লোকজনের যাতায়াত কম—তদুপরি দিনদুপুরেও বেশীভাগ এই দিকেই বাঘের দেখা পাওয়া যেত ব'লে এদিকটা একপ্রকার 'পড়ো' হয়েই গিয়েছিল ! সুতরাং রত্নার বাড়ীর এই পরিবর্ত্তন কারও চোখে পড়ে নি।—আরও বিস্ময়ের কথা কিছুদূর থাকতেই প্রফুল্ল লক্ষ্য করেছিল যে, গোয়ালঘরে বাতি জ্বলছিল। কিন্তু তারা কাছে আসার সঙ্গে সঙ্গেই আলো নিবে গেল ; কিসের একটা শব্দও হল—তারপর একেবারে চুপ !

প্রফুল্ল হতভম্ব হয়ে গেল—কিছুই বুঝতে পারল না। প্রথমে ভাবল এটি ভৌতিক ব্যাপার। পরে আবার ভাবল—শিবু জেলে ত মিথ্যা বলবার লোক নয়। তখন তার মনে পড়ল—এই সংবাদ দেবার সময়ে শিবুর চোখে মুখে একটা চাপা হাসির আলো যেন ফুটে উঠেছিল। নিশ্চয়ই এর মধ্যে কোন রহস্য আছে।

প্রফুল্ল এগিয়ে গিয়ে দেখল গোয়ালঘরের দরজায় তালা দেওয়া। রহস্য আরও ঘনীভূত হল।

অবশেষে প্রফুল্ল রত্নার ঘরের দরজায় করাঘাত ক'রে তাকে ডাকাডাকি করতে লাগল। খানিকক্ষণ ডাকাডাকির পর রত্না একটা বিরক্তিসূচক শব্দ ক'রে চোখ রগড়াতে রগড়াতে এসে দরজা খুলে দিল।

প্রফুল্লই প্রথমে কথা বলল—"হাঁরে রত্না, তোর গোয়ালঘরে কি আজ রাত্রে বাঘ ঢুকেছিল ?"

রত্না হেসে উত্তর দিল—"পাগল হয়েছেন খোকাবাবু! বাঘের ভয়েই না গোয়ালঘর টিনের করলাম।"

প্রফুল্লের মনে দৃঢ় ধারণা হয়েছিল যে, ঐ গোয়ালঘরের মধ্যেই কোন রহস্য আছে। রতন নাপিত এ ক'দিনের মধ্যে টিনের গোয়াল করবার মত টাকা পেল কোথায় ? রত্নার এমন কিছু বেশী চতুষ্পদ বা দ্বিপদ সম্পত্তি ছিল না, যার জন্য এত বড় একটা গোয়ালঘর লাগতে পারে। ঐ গোয়ালঘরটা দেখতেই হবে। প্রকাশ্যে বলল—"সত্যিই নাকি রে ? আচ্ছা চল দেখি

তোর নূতন গোয়ালঘরটা কেমন হয়েছে। যদি পছন্দ হয়, আমিও ঐ রকম একটা করিয়ে নেব। যা বাঘের উপদ্রব সুরু হয়েছে—সাবধান হওয়া ভাল। চল আর রাত করিস্ নে—যখন এসেছি দেখেই যাই।”

রতনের কিন্তু নড়বার কোন উদ্যোগ দেখা গেল না—সে নানারূপ ওজর-আপত্তি দেখাতে লাগল। প্রফুল্লের সন্দেহ আরও ঘনীভূত হল। রতন যখন স্বেচ্ছায় তালা খুলল না, তখন প্রফুল্ল হুকুম দিল—জোর ক'রে দরজা খুলতে। রতন দু-একবার পুলিশের ভয় দেখাল, কিন্তু সে-কথা কোন কাজে এল না।

গোয়ালের দরজা ভেঙ্গে ঘরে প্রবেশ ক'রে সবাই যা দেখল তাতে তাদের চক্ষুস্থির! ঘরের এক কোণে কতকগুলো হাঁসের ও মুরগীর পালক আর হাড়গোড় জড় ক'রে রাখা—এক কোণে রক্তমাখা একটা পাঁঠার চামড়া প'ড়ে আছে—তা থেকে রক্ত গড়িয়ে চাপ ধ'রে আছে। অন্যদিকে পাঁচ-ছ'টা

পাঁঠা, দু'-তিনটা খাসি ও দশ-বারোটা হাঁস ও মুরগী 'জিয়ান' রয়েছে! বলা বাহুল্য ঐগুলোর মধ্যে প্রত্যেকটাই কারও না কারও পরিচিত এবং গত তিন-চার রাত্রির মধ্যে ব্যাঘ্র-কর্ত্তৃক অপহৃত! এক ছোকরা অন্য এক কোণ হতে একটা বড় হাঁড়ি টেনে বের করল—তার ভিতরে একটা কাগজে জড়ান পদার্থ। কাগজের আবরণ খুলতেই তার ভিতর হতে বেরুল—একটা পুরাণো মস্ত লেজ-ওয়ালা বাঘের ছাল—বোধ হয় কোনও যাত্রার দলের অব্যবহার্য্য সম্পত্তি।

ঠিক এমন সময়ই গোয়ালঘরের দরজায় মাথা ঢুকিয়ে শিবু জেলে ব'লে উঠল—"কি ছোটবাবু, বাঘ শিকার হল?"

ঘরময় একটা হাসির রোল প'ড়ে গেল! রত্না কটমট ক'রে বুড়ো শিবুর পানে তাকাতে লাগল—পারলে বোধ হয় তার মুণ্ড ছিঁড়ে খায়!

শিবু তখন বলতে লাগল—"তবে বলি,—কেমন ক'রে এ অঘটন ঘটল। জানেনই তো

আমার রাতে বেড়ান একটা নেশা। অন্যদিনের মত আজও চলেছিলাম রত্নার গোয়ালের পাশ দিয়ে। হঠাৎ দেখি গোয়ালঘরে আলো জ্বলছে—আর দু'-একজন লোকের মৃদু গলার আওয়াজও পাওয়া যাচ্ছে। বড় কৌতূহল হল। গোয়ালের বেড়ার কাছে চুপিসারে গিয়ে একটা টিনের ছিদ্রে চোখ রেখে দেখলাম—ঘরে অনেকগুলো পাঁঠা, হাঁস, মুরগী প্রভৃতি। একটা পাঁঠা সদ্যঃ কাটা হয়ে ছাল ছাড়ান অবস্থায় ঐ বাঁশে ঝুলছে। অন্য একটা লোকের সাথে রত্নার দর-কষাকষি হচ্ছে—বোধ হয় ঐ পাঁঠাটার সম্বন্ধেই। এই পর্য্যন্ত দেখেই সব বুঝলাম—তাড়াতাড়ি গিয়ে তোমাদের খবর দিয়েছিলাম যে রত্নার গোয়ালঘরে গেলেই বাঘ পাবে। কেমন সত্যি বলেছি কি-না ?"—এই পর্য্যন্ত ব'লে বুড়ো হো-হো ক'রে হেসে উঠল ; অন্য সকলেও সেই হাসিতে যোগ দিল।

দু'-একজন রত্নাকে পুলিশের হাতে দিতে চেয়েছিল ; কিন্তু অধিকাংশের মতে গ্রাম্য পঞ্চায়েতী

বিচার হল। রতনের শাস্তি হল—ছ'মাস অর্দ্ধেক মজুরিতে গ্রামের সবাইর ক্ষৌরকর্ম্ম করতে হবে। বাকি অর্দ্ধেক মজুরি মাসে মাসে জমা হয়ে ছ'মাস অন্তে ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ গরীব সিধুকে দেওয়া হবে।

রত্না অবশেষে স্বীকার করল যে, সে গ্রামে বাঘের ভয় জাগিয়ে দিয়ে—পাঁঠা, হাঁস প্রভৃতি চুরি ক'রে বিক্রয় করত—তাতে বেশ মোটা রকম রোজগারই হত!

বলা বাহুল্য, তার পর হতে গ্রামে বাঘের উপদ্রব একেবারেই বন্ধ হয়ে গেল।

চক্ষুদান

নগরের এক প্রান্ত। শীর্ণা নদীতীরে পাতায় ছাওয়া এক জীর্ণ কুটীর। তাতে বাস করেন এক ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণী—তাঁদের জীর্ণ সংসার নিয়ে। বড় গরীব তাঁরা—'দিন আনে দিন খায়', বড় কষ্টে দিন যায়। ব্রাহ্মণীর পরনে একখানা ভাল কাপড় নেই, গায়ে গয়না নেই; তবু তাঁর মুখে রা-টি নেই।

ব্রাহ্মণ পাঁচ দোরে ঘুরে দিনান্তে সামান্য যা কিছু নিয়ে ঘরে ফিরেন—ব্রাহ্মণী তাই রান্না ক'রে স্বামীর সামনে ধ'রে দেন—স্বামীর পাতে যা অবশিষ্ট থাকে তাই ভক্তিভরে মুখে দেন। অভাবকে তাঁরা আমলই দেন না। এমনি ভাবে অভুক্ত, অর্দ্ধভুক্ত অবস্থায়, কষ্টে-স্বষ্টে তাঁদের দিন এক রকম কেটে যাচ্ছিল।

কিছুদিন পরে ব্রাহ্মণীর একটি সোনার চাঁদ ছেলে হল। ছেলের রূপে ঘর আলো—ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীর মন আলো হল।

কিন্তু কিছুদিন যেতে না-যেতেই পুত্রলাভের আনন্দ চাপা প'ড়ে গেল—দারিদ্র্যের কঠোরতায়। একদিন সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্য্যন্ত ঘুরে ঘুরেও ব্রাহ্মণ শিশুপুত্রের জন্য এক ফোঁটা দুধ যোগাড় করতে পারলেন না; শুষ্কমুখে ক্লান্ত দেহটাকে টানতে টানতে বাড়ী এসেই দাওয়ার উপর ব'সে পড়লেন; ছেলেটার মুখের দিকে তাকাতেই চোখ দিয়ে হু-হু ক'রে জল এল।

সেদিন উনানে আর হাঁড়ি চড়ল না। ছেলেটা কেঁদে ঘুমিয়ে পড়েছে—ব্রাহ্মণীও ছেলেকে বুকে টেনে নিয়ে অশ্রুজল ফেলতে ফেলতে নিদ্রার শান্তিময় ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করেছেন। ব্রাহ্মণের চোখে ঘুম নেই। 'এই নিষ্ঠুর দরিদ্রতার হাত থেকে উদ্ধার পাওয়া যায় কেমন ক'রে?'—সেই চিন্তাই তাঁর মাথায় ঘুরে বেড়াতে লাগল। পূর্ব্বে দেশের রাজারা দীন দরিদ্র ব্রাহ্মণদের সাহায্য করতেন—আর আজ?

অনেক চিন্তার পর মাঝরাত্রে ব্রাহ্মণ বিছানায়

উঠে বসলেন; ব'সে ব্রাহ্মণীকে ডাকলেন—"ওগো!" ব্রাহ্মণী তখন মানসিক ও দৈহিক ক্লান্তিতে গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন—তাঁর কাছ থেকে কোন সাড়াই মিলল না।

ব্রাহ্মণীর গায়ে একটা ঠেলা দিয়ে ব্রাহ্মণ আবার ডাকলেন—"ওগো, শুনছ?"

ব্রাহ্মণী ধড়মড়িয়ে উঠে বললেন—"কি—কি বলছ?"

ব্রাহ্মণ বললেন—"কাল একবার রাজবাড়ীতে যাব ভাবছি। দেখি যদি রাজার কাছ থেকে কিছু আদায় করা যায়। এভাবে—"

ব্রাহ্মণী বাধা দিয়ে বললেন—"তুমি কি পাগল হয়েছ? দেখছি অতিরিক্ত ভেবে ভেবে তোমার মাথা সত্যি সত্যি খারাপ হয়ে গেছে। যে কৃপণ 'রাজা—হাতের ফাঁকে জল গলে না! শুনি, দীন দরিদ্র ভিখারীও প্রার্থী হয়ে গেলে 'দূর দূর' ক'রে তাড়িয়ে দেন। সে হেন কঞ্জুসের কাছ থেকে তুমি কি আদায় করবে? হয়তো রাজবাড়ীর দেউড়ী

থেকেই সিপাইর হাতে গলাধাক্কা খেয়ে অপমানিত হয়ে ফিরে আসবে। কাজ নেই যেচে অপমান মাথায় নিয়ে। ভগবান যা করবেন, তাই হবে। তুমি এখন একটু ঘুমোও দেখি—মাথা ঠাণ্ডা ক'রে।"

ব্রাহ্মণ জবাব দিলেন—"না ব্রাহ্মণী, তুমি বুঝতে পারছ না। নিজেরা দু'দিন না খেতে পেলেও দুঃখ ছিল না। কিন্তু ঐ কচিশিশু—ওর জন্যে এক ফোঁটা দুধের যোগাড় আমি করতে পারলাম না—এ ব্যথা আমার বুকে বড় বেজেছে। সামনে আর অন্য পথ চোখে পড়ছে না—কাজেই রাজবাড়ীতে কাল আমি যাবই। অনেক চিন্তার পর একটা কথা মনে এসেছে—দেখি তাতে কাজ হাসিল ক'রে আসতে পারি কিনা। তুমি কাল খুব সকালে উঠে আমার ধুতিটা আর উড়ুনিটা ক্ষার দিয়ে কেচে দিও তো! বুঝলে?"

"হাঁগো, বুঝেছি" ব'লে ব্রাহ্মণী আবার পাশ ফিরে শুয়ে পড়লেন। ব্রাহ্মণও যেন অনেকটা

নিশ্চিন্ত হলেন—কাজেই শোবার সাথে সাথেই গভীর নিদ্রায় ঢ'লে পড়লেন।

... ...

রাজা জনকয়েক পাত্রমিত্র নিয়ে রাজসভা আলো ক'রে ব'সে আছেন। সভার চারদিক নিস্তব্ধ—লোকজন শূন্য। সিপাইসান্ত্রীর আনাগোনা নেই, প্রজাদের আগমন নেই—প্রার্থীদের তো 'প্রবেশ নিষেধ'ই; এক পয়সা অপব্যয় করবার মত দুর্ব্বুদ্ধি রাজার মোটেই নেই।

এমনি সময় ফোঁটা-তিলক কেটে, পরিষ্কার ধুতি-চাদর প'রে, ব্রাহ্মণ রাজসভায় প্রবেশ করলেন—"মহারাজের জয় হোক" ব'লে সোজা রাজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন।

তাঁকে দেখেই রাজা ভাবলেন—এ ব্রাহ্মণ নিশ্চয়ই কিছু প্রার্থী হয়ে এসেছে। সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর মেজাজটা হয়ে গেল রুক্ষ। ব্রাহ্মণ দ্বিতীয় বাক্য উচ্চারণ করবার পূর্ব্বেই রাজা ব'লে উঠলেন—"এখানে ওসব বুজরুকি চলবে না

ঠাকুর ! ছুটো খোসামুদির কথা ব'লে হাত পাতলেই পাওয়া যেতে পারে--টাকাকড়ি এমন সস্তা নয়। অতএব ঐ সোজা রাস্তা দেখ ঠাকুর।" ব'লে আঙ্গুল দিয়ে বাইরের দরজাটা দেখিয়ে দিলেন।
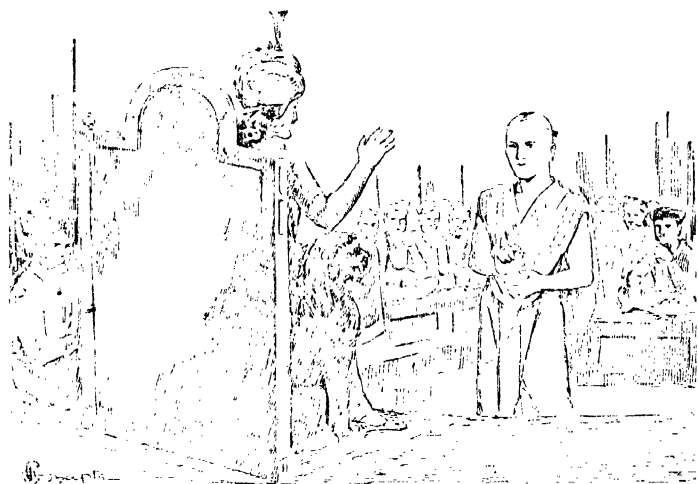
ব্রাহ্মণ স্মিতমুখে বললেন---"মহারাজ ! আমি এসেছি আপনাকে একটা মস্ত বড় সুসংবাদ দিতে ! তাতে লাভ হবে আপনারই সম্পূর্ণ।"

সেই কথা শুনে সভাস্থ সকলেরই চোখে-মুখে একটা ঔৎসুক্যের ভাব ফুটে উঠল। রাজাও

দস্তুরমত উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন—সিংহাসন থেকে নেমে ব্রাহ্মণের পদধূলি মাথায় নিলেন, পরম সমাদর ক'রে তাঁকে আসনে বসালেন ; তারপর বললেন—"ঠাকুর, অপরাধ নেবেন না। দিনরাত যত সব আজে বাজে লোক এসে বিরক্ত করে, মেজাজটা ঠিক রাখতে দেয় না। আপনাকে না চিনতে পেরে বড়ই অন্যায় ব্যবহার করেছি। এখন দয়া ক'রে বলুন, কি সুসংবাদ আপনি আমার জন্যে বহন ক'রে এনেছেন—শুনে আমি কৃতার্থ হই।"

ব্রাহ্মণ মনে মনে হাসলেন—মুখে বেশ একটু গাম্ভীর্য্যের ভাব এনে বলতে লাগলেন—"মহারাজ, আপনার সুশাসনে, সুবিচারে, রাজ্যমধ্যে অভাব-অভিযোগ কারও ছায়া মাড়াতে পারে না।

পিতৃপুরুষগণের অগাধ পুণ্যের বলেই আমি এইমাত্র স্বর্গ থেকে ঘুরে এলাম। একদিন স্বর্গ-রাজ্যের রাস্তা দিয়ে অন্যমনস্কভাবে এদিক-সেদিক বেড়াচ্ছি। বেড়াতে বেড়াতে একেবারে গিয়ে পড়লাম মন্দাকিনীর ধারে। পাশেই দেখি, এক

মস্ত বড় মনোরম উদ্যান—অপূর্ব্ব কারুকার্য্যখচিত তার দেউড়ী। ভিতরে ঢুকে পড়লাম। পারিজাতের গন্ধে মাতোয়ারা, বিহগের কলতানে সদা মুখর, রংবেরঙের ফুলের হাসিতে উজ্জ্বল—প্রজাপতির রঙীন পাখার বর্ণ-বৈচিত্র্যে ঝলমল—সেই মনোহর উদ্যান দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম—চোখ জুড়িয়ে গেল।

উদ্যানের মাঝখানে দুধের মত সাদা ধবধবে অতি প্রকাণ্ড এক সুরম্য প্রাসাদ—স্বর্গশিল্পী বিশ্ব-কর্ম্মার নিপুণহস্তে রচিত অপূর্ব্ব কারুকলা! প্রবেশদ্বারে উজ্জ্বল রত্নখচিত পরিচ্ছদে সুসজ্জিত প্রহরীর দল দিবারাত্র পাহারা দিচ্ছে। সাহস ক'রে এগিয়ে গিয়ে একজন সিপাইকে প্রশ্ন করলাম—'সিপাইজী' এ বাড়ীটা কার?'

সিপাইজী করুণনয়নে আমার দিকে তাকিয়ে উত্তর দিলে—'এ বাড়ী এখনও খালি আছে। রতনপুরের রাজার স্বর্গবাসের জন্য এই প্রাসাদ নির্ম্মিত হয়েছে।' "

এই পর্য্যন্ত শুনেই রাজা সবিস্ময়ে ব'লে উঠলেন —"অ্যাঁ! সত্যি?—তার পর—তার পর?"

"অত ব্যস্ত হবেন না মহারাজ! অত ব্যস্ত হবেন না।"—ব'লে ব্রাহ্মণ বলতে লাগলেন—"মনে বড়ই কৌতূহল হল। মহারাজের স্বর্গবাসের জন্য অমন সুরম্য অট্টালিকা তৈরী হয়েছে—ভিতরটা একবার দেখে মহারাজকে আগে থাকতেই খবরটা না দিতে পারলে মনটা কিছুতেই সুস্থির হতে চাইছিল না। কাজেই সিপাইজীকে বললাম—'সিপাইজী, এ ব্রাহ্মণ মহারাজেরই খাস তালুকের প্রজা। দরজাটা একটু ছাড় দেখি—ভিতরটা এক চক্কর দেখে আসি।' শুনেই তো প্রহরীটা সসম্ভ্রমে পথ ছেড়ে দিলে—আমিও ধীরপাদক্ষেপে ভিতরে ঢুকলাম—"

—"অ্যাঁ! সিপাইটা আমার প্রজা শুনেই আপনাকে পথ ছেড়ে দিলে! বেটা লোক ভালই বলতে হবে। প্রাসাদে গিয়েই ওকে বেশ মোটা রকম পুরস্কার দিতে হবে।...হ্যাঁ, তার পর?"

—"প্রাসাদের ভিতর ঢুকে যেদিকে তাকাই—চোখ আর ফিরাতে ইচ্ছা করে না। সমস্ত বাড়ীটা কতই না কারুকার্য্যে ভরা, রংবেরঙের রত্নমণ্ডিত—হীরাজহরতের দ্যুতিতেই ঘর আলো হয়ে আছে। দরজা-জানালা, আসবাবপত্র সব সোনার পাতে মোড়া। এমনি ঘরের পর ঘর পার হয়ে একটা ঘরের দরজায় গিয়ে থমকে দাঁড়ালাম—ভিতর দিকে চাইতেই চোখ ঝল্‌সে গেল। সে ঘরটাই সব চেয়ে জাঁকালো! ঘরের মাঝখানে অতি সুন্দর একখানা পালঙ্ক—গায়ে তার কত না চুণিপান্না বসান সূক্ষ্ম-কারুকার্য্য। মতির ঝালর দেওয়া রত্নখচিত অতি মনোহর চাঁদোয়া। অতি সূক্ষ্ম রেশমী মশারি খাটান। খাটের উপর বিচিত্র দুগ্ধ-ফেননিভ শয্যা! বুঝলাম এটা মহারাজের খাস কামরা।"

ব্রাহ্মণের মুখে এই সব ঐশ্বর্য্যের বর্ণনা শুনতে শুনতে অর্থপিশাচ রাজার প্রায় দম বন্ধ হয়ে আসছিল। তিনি আর ধৈর্য্য ধরতে পারছিলেন না—সম্ভব হলে তখনি হয়ত এ মরজগৎ ছেড়ে সশরীরেই

সেই উদ্যান-ঘেরা প্রাসাদের অধিকার নিতেন। তিনি অধীরভাবে বললন—"তার পর ?"

"তার পরের কথাটাই যা একটু গোলমাল, মহারাজ!" ব'লে ব্রাহ্মণ যেন মহাচিন্তিত হয়ে পড়লেন।

"কেন ? কেন ?—রাজার চোখে-মুখে উদ্বেগের ছায়া, যেন একটা রাজ্যই হারাতে বসেছেন!

—"সবই তো চমৎকার, মহারাজ! কিন্তু অমন যে মূল্যবান সুদৃশ্য মশারিটা—তাতে মস্ত বড় একটা ছিদ্র।—স্বর্গের মশাগুলো আবার আমাদের মর্ত্ত্যের মশার চেয়ে অনেক বড়—আর তাদের হুলগুলোও তেমনই ভীষণ—প্রায় গণ্ডারের নাকের খড়্গের মত! ঐ ছিদ্র দিয়ে ঢুকে একটা মশা যদি মহারাজের গায়ে হুল ফুটিয়ে দেয়, তবে অমন নবনীত-কোমল শয্যায় শুয়েও ত মহারাজের সুখ-নিদ্রা হবে না—সেই ভাবনায় অস্থির হয়েই তো আমি ছুটে এসেছি আপনাকে জানাতে—এর প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা করা যায় কিনা ?"

এ কথা শুনেই রাজার চোখ উঠল কপালে—মুখ গেল শুকিয়ে—গলা হল কাঠ! "তাই তো, তবে উপায়?"—ব'লে হতাশভাবে তিনি ব'সে রইলেন।

তখন সব মাথা এক জায়গায় হল—এর একটা প্রতিকার করতেই হবে! কিন্তু বহুক্ষণ যায়—কোন বুদ্ধিই আর স্থির হয় না।

হঠাৎ ব্রাহ্মণ সোৎসাহে ব'লে উঠলেন—"হয়েছে মহারাজ! হয়েছে—বুদ্ধি ঠিক হয়েছে।"

"কি? কি?"—বলতে বলতে সপারিষদ্ রাজা সাগ্রহে সোজা হয়ে বসলেন।

"অতি সহজ ব্যাপার, মহারাজ! এ পৃথিবী থেকে বিদায় নেওয়ার সময় একটা সূঁচ আর খানিকটা সূতো সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবেন—ছিদ্রটা একটু রিফু ক'রে নিলেই আর কোন অসুবিধা থাকবে না—পরম নিশ্চিন্তে, দিব্যি আরামে নিদ্রা যেতে পারবেন।"—ব'লে ব্রাহ্মণ মুখখানা বেশ গম্ভীর ক'রে রইলেন।

রাজা নিতান্ত নিরাশভাবে বললেন—"কি যে বলেন, ঠাকুর! তাও কি কখনও সম্ভব?"

"সম্ভব নয় কেন, মহারাজ? এই অগাধ ঐশ্বর্য্যের—অপরিমেয় শক্তির মালিক আপনি—মরবার সময় অতি তুচ্ছ একটা সূঁচ-সূতো সঙ্গে ক'রে নিয়ে যেতে পারবেন না?" ব'লে ব্রাহ্মণ একটু চুপ ক'রে রইলেন; পরে বলতে লাগলেন—"সঙ্গে ক'রে কিছু যদি না-ই নিতে পারবেন, তবে নিজেকে —দীন-দুঃখী, অন্ধ-আতুর, পুত্রসম নিজ প্রজাদের বঞ্চিত ক'রে, দিনের পর দিন আপনি কিসের আশায় রাজকোষ বোঝাই ক'রে যাচ্ছেন?—একটা ভিখারী আপনার দরজায় দাঁড়ালে তাকে 'দূর দূর' ক'রে তাড়িয়ে দেন—সে হয়ত মনে মনে আপনাকে কত না অভিসম্পাত ক'রে যায়! দিনের পর দিন, একটু একটু ক'রে অভিশাপের বোঝা বাড়িয়ে চলেছেন আপনি যার বিনিময়ে—মরবার সময় তার এক কণাও আপনার সাথে যাবে না?"

রাজা এতক্ষণ স্তব্ধ হয়ে ব্রাহ্মণের কথাগুলো

শুনে যাচ্ছিলেন। তাঁর কথা শেষ হতেই তিনি হঠাৎ সিংহাসন থেকে নেমে একেবারে ব্রাহ্মণের পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়লেন; অশ্রু-রুদ্ধ-কণ্ঠে বললেন—“ঠাকুর, আপনার কথায় আজ আমার মোহ কেটেছে। আমি এতদিন বৃথাই অর্থের মায়ায় মুগ্ধ ছিলাম। আজ পর্য্যন্ত কেউ আমায় সরল সত্যপথ দেখায় নি। আপনিই কৃপা ক'রে আমার জ্ঞানচক্ষু ফুটিয়ে দিয়েছেন। আজ থেকে আপনিই আমার গুরু!” তৎক্ষণাৎ কোষাধ্যক্ষকে ডেকে রাজা হুকুম দিলেন—“আজ থেকে রাজকোষের অর্থ সর্ব্বসাধারণের জন্য উৎসর্গীকৃত হোক। কোন দরিদ্র-নারায়ণ যেন আমার প্রাসাদ থেকে বিমুখ না হয়ে যায়।”

রাজার আদেশে চারদিকে অতিথিশালা খোলা হল, পুষ্করিণী খনন করা হল, চিকিৎসালয় খোলা হল। রাজবাড়ীর দ্বার ছোট-বড় সবার জন্য সদা উন্মুক্ত হল।

রাজা আজ নূতন মানুষ!

ব্রাহ্মণ আজ রাজগুরু—তাঁর সংসারের মূর্ত্তি বদলে গেছে। ব্রাহ্মণী কিন্তু আজও তেমনই নিজের হাতে স্বামী-পুত্রের সেবাযত্ন করেন—সংসারের যাবতীয় কাজকর্ম্ম করেন। অর্থের মোহ তাঁর রুচিকে বিন্দুমাত্র বিকৃত করতে পারে নি।
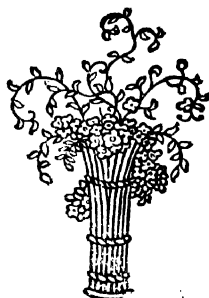
নেড়ুদা

'নেড়ুদা'কে চিনত না এমন ছেলে আশেপাশের কয়েকখানা গাঁয়ে একটিও খুঁজে পাওয়া যেত কিনা সন্দেহ। গায়ের জোরে, বুদ্ধির তীক্ষ্ণতায়, অসমসাহসে, তার সমকক্ষ একজনও ছিল না। পরের আপদে বিপদে অমন ক'রে বুক পেতে দিতে কেউই পারত না। গাঁয়ের 'সৎসঙ্গ' হতে সুরু ক'রে 'সৎকার-সমিতি' পর্য্যন্ত সকল প্রতিষ্ঠানেরই পাণ্ডা ছিল নেড়ুদা।

তাই ব'লে যদি কেউ মনে করে যে নেড়ুদা ছিল বখাটে—শুধু মোড়লি ক'রে আর পাড়া বেড়িয়েই দিন কাটাত, তবে সে মস্ত ভুল করবে! ক্লাসে সে ছিল ফার্ষ্ট বয়। ক্লাসের সময় ও পরীক্ষার পূর্ব্বে ছাড়া সারাদিন বইয়ের সাথে তার কোন সংস্রব কারও চোখে পড়ত না—অথচ কেউ ভেবেই পেত না—কি ক'রে সে বছরের পর বছর ফার্ষ্ট

হয়ে প্রমোশন পেত, আর সকলের চোখের উপর দিয়ে গাদাগাদা চক্‌চকে প্রাইজের বইগুলো নিয়ে বাড়ী ফিরত !

নেড়ুদা ভোর চারটায় উঠে পড়তে বসত— দু'ঘণ্টা গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়ত—এই ছিল তার রোজকার অভ্যাস। ভোররাত্রে নিরিবিলিতে ও দেহমনের তাজা অবস্থায় যা পড়া যায় তাই মনের মধ্যে ভালভাবে গেঁথে যায় ; এ সত্যটা পরে অবশ্য আমরা বুঝেছিলাম—কিন্তু খুবই বিলম্বে, সময় হারিয়ে।

'নেড়ুদা' নামটার একটি ছোট্ট ইতিহাস আছে। তার পোষাকি নাম হল 'জ্যোতির্ম্ময়'। ওর বাবা ছিলেন ডুয়ার্সে এক চা-বাগানের ম্যানেজার। সপরিবারে সেখানেই বাস করতেন—গ্রামে বড় একটা আসতেন না। নেড়ুদার বয়স যখন বছর সাত-আট, তখন তিনি হঠাৎ মারা যান। তখন নেড়ুদাকে নিয়ে তার মা গাঁয়ে বাস করতে এলেন। কিছু সঞ্চিত অর্থ ছিল—তাতেই মা ও

ছেলের দিন মোটামুটি ভাবে চ'লে যেত। নেড়ুদার মামার ইচ্ছা ছিল ওদের নিজের বাড়ীতেই রাখে ; কিন্তু তার মা, অবশিষ্ট জীবন শ্বশুরের ভিটা ছেড়ে থাকতে কিছুতেই রাজি হন নি।

নেড়ু প্রথম যেদিন ক্লাসে উপস্থিত হল—সেদিন সর্ব্বাগ্রে ক্লাসশুদ্ধ সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল তার খুবই পাতলা চুলওয়ালা বড় মাথাটা আর বড় বড় উজ্জ্বল চক্ষু দুটির উপর। সেই দিন হতেই ক্লাসে তার নাম হয়ে গেল 'নেড়া'। নেড়া ব'লে ডাকলেও সে কিন্তু মোটেই চটত না, বরং দু'-চার দিনের মধ্যেই সে ক্লাসে বেশ আধিপত্য বিস্তার ক'রে ফেলল—ফলে 'নেড়া' পরিবর্ত্তিত হয়ে দাঁড়াল 'নেড়ুদা'। তার পোষাকি নামটা চাপাই প'ড়ে গেল।

ছেলেবেলাকার একটা তুচ্ছ ঘটনা হতেই বুঝতে পারা যাবে যে, নেড়ুর হৃদয়টা ছিল কত বড়—আর তার বুদ্ধিটাও ছিল কেমন প্রখর!

নেড়ুর বয়স তখন হবে দশ-এগারো বছর।

সে বাড়ীর সামনেই তার নিজস্ব ছোট্ট শাকসব্জির বাগানে ব'সে কাজ করছিল। পরীক্ষার পড়া তৈরী করবার জন্য স্কুল কয়েক দিনের জন্য ছুটি; কাজেই নাওয়া খাওয়ার বিশেষ তাড়া ছিল না।

মা ডেকে বললেন—"নেড়ু, যা না বাবা দৌড়ে—ডাকঘর থেকে একখানা খাম নিয়ে আয়। এক ছুটে যাবি, আর এক ছুটে আসবি—কোথাও দেরী করিস্ নে যেন। এসে স্নান করবি—খাবি।"

"না গো না—দেরী করব কেন?—এই এলাম ব'লে। তুমি ভাত বাড়তে থাক না—আমি আসবার সময় জমীদার-বাড়ীর পুকুরটায় একটা ডুব দিয়ে চ'লে আসব'খন।" এই ব'লে মায়ের হাত হতে পয়সা নিয়েই নেড়ু ছুটল ডাকঘরের দিকে। বেলা তখন দুপুর।

পুঁটেদের বাড়ীর কাছাকাছি যেতেই পুঁটে ডেকে বলল—"এই শোন না ভাই নেড়ুদা! এই অঙ্ক ক'টা আমায় বুঝিয়ে দে। পরীক্ষার আর ক'টা দিনই বা বাকি আছে—অথচ এই অঙ্কটা

কিচ্ছুতেই হল না ভাই এখনও! কি যে হবে!” পুঁটে একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল।

নেড়ু প্রথমটা একটু ইতস্ততঃ করছিল— তার চোখে তখন হয়ত ভেসে উঠেছিল মায়ের রুদ্রমূর্ত্তি! কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই পুঁটের মলিন মুখখানার দিকে চেয়েই সে কর্ত্তব্য স্থির ক'রে ফেলল। তার মনে হল—আহা! সত্যই তো

বেচারি অঙ্কে বড় কাঁচা!—ব্যস্, নেড়ু অমনি ব'সে গেল পুঁটেকে অঙ্ক বুঝাতে।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাতে লাগল—সেদিকে কারও হুঁস নেই।—এমনি সুন্দরভাবেই নেড়ু অঙ্ক বুঝাতে পারত। মাঝে পুঁটে একবার জিজ্ঞেস করেছিল—"নেড়ুদা, তোমার খাওয়া-দাওয়া হয়েছে তো?"

নেড়ু উত্তর দিয়েছিল—"হুঁ।"—ব্যস ঐ পর্য্যন্তই।

এদিকে নেড়ুর মা ভাতের হাঁড়ি আগলিয়ে ঠায় ব'সে আছেন—নেড়ুর অপেক্ষায়। কিন্তু কোথায় নেড়ু—তার দেখাই নেই! ওদিকে মাথার সূর্য্য পশ্চিমে হেলে পড়ল। মায়ের রাগটাও ক্রমশঃ বেড়েই চলল। ঘণ্টা দু'-তিন থেকেও যখন নেড়ুর টিকিটিও দেখা গেল না—তখন তিনি রাগে গজ্ গজ্ ক'রে—"আসুক হতভাগা আজ বাড়ীতে—পিঠের চামড়া তুলে নেব। দিন দিন বড় বাড় বাড়ছে। আজ বাদে কাল পরীক্ষা—পড়াশুনার নাম নেই—খাওয়া-দাওয়ার কথা পর্য্যন্ত খেয়াল নেই!" বলতে বলতে রান্নাঘরের শিকল

এঁটে দাওয়ার উপরেই আঁচল বিছিয়ে শুয়ে পড়লেন।

বেলা প্রায় তিনটার সময় বের হয়েই নেড়ু চমকে গেল—বেলা যে অনেকখানি গড়িয়ে গেছে! ডাকঘর তো বন্ধ হয়ে যাবে—খাম কিনবার কথা সে এতক্ষণ তো বেমালুম ভুলেই গিয়েছিল। সে ছুটে চলল ডাকঘরের দিকে।

পিছন হতে পুঁটে ডেকে বলল—"নেড়ুদা, কাল দুপুরে আসবে তো ভাই?"

ছুটতে ছুটতেই নেড়ু উত্তর করল—"হ্যাঁ—নিশ্চয়ই।"

খাম কিনে বাড়ী ফেরার পথে নেড়ু ভাবতে লাগল—মা তো নিশ্চয়ই রেগে 'টং' হয়ে আছেন; বাড়ী গেলেই রাগের জ্বালায় হাড় ক'খানা আস্ত রাখবেন না। মায়ের রাগটা যাতে পড়ে, তেমন একটা ফন্দী না বের করতে পারলে তো আর চলছে না!

নেড়ুর উর্ব্বর মস্তিকে ফন্দী যোগাতে বিলম্ব

হল না। সে কোথায় যেন শুনেছিল খুব রাগের সময় কোন একটা হাসির কথা মনে করলেই চট ক'রে রাগটা প'ড়ে যায়! মাকে একবার হাসাতে পারলেই তাঁর সব রাগ 'জল' হয়ে যাবে। ফন্দীটার কথা মনে মনে আলোচনা ক'রে সে নিজে নিজেই খানিকটা হেসে নিল। ফন্দীটার অনিবার্য্য সাফল্য সে যেন দিব্যচক্ষে দেখতে পেল।

বাড়ীর কাছাকাছি এসেই নেড়ু ছুটতে লাগল। দরজার বাইরে থাকতেই সে চীৎকার জুড়ে দিল—"মা, মাগো!—শীগ্‌গির ধর, বড্ডো গরম—উহুহুঃ! গেল, গেল—হাতটা পুড়ে গেল!" বলতে বলতে সে হুড়মুড় ক'রে ঢুকে পড়ল বাড়ীর ভিতর।

দাওয়ায় শুয়ে ভাবতে ভাবতে মায়ের রাগটা আপনা হতেই 'পড়ি পড়ি' করছিল। এমন সময় ছেলের সাড়া পেয়েই সেটা আবার দপ্‌ ক'রে জ্বলে উঠল। দাওয়ার এক পাশেই রান্নার জন্য চেলা কাঠের গাদা ছিল—সেখান হতে একটা চেলা কাঠ তুলে নিয়ে—"হতচ্ছাড়া ছেলে, আজ তোরই

একদিন কি আমারই একদিন! আজ তোকে মেরেই খুন করব—তারপর না হয় নিজে নিজে 'আত্মহত্যে' হব—এমনি ক'রে জ্বালিয়ে খাবি রোজ।"—বলতে বলতে তিনি নেড়ুকে তেড়ে গেলেন।

"আঃ—আগে এইটে ধরই না ছাই! উহুহুঃ—হাত যে পুড়েই গেল—উঃ!—মাগো!" বলতে বলতে নেড়ুর মুখখানা কাঁদ-কাঁদ হয়ে গেল।

হাজার হোক—মায়ের প্রাণ তো! ছেলের

কষ্ট দেখলে আর স্থির থাকতে পারে না। রাগটা পূরামাত্রায় থাকলেও তিনি নেড়ুর হাত থেকে কলাপাতার ঠোঙাটা টেনে নিলেন।

কৈ রে, এটা তো ঠাণ্ডা—হিম; গরম কোথায়?—কি আছে এর ভিতর?” বলতে বলতে মা সেটা খুলতে লাগলেন। নেড়ু আড়চোখে দেখতে লাগল।

ঠোঙাটা খুলতেই একখানা খাম টুপ ক'রে মাটিতে পড়ল। মা প্রথমটা অবাক্ হয়ে ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন—“একি রে?—'বড্ডো গরম, হাত পুড়ে গেল' ব'লে এতক্ষণ ষাঁড়ের মত চেঁচাচ্ছিলি কেন? এটা তো একখানা খাম। শয়তানির আর জায়গা পাস্ নি, না রে নেড়ু?” বলতে বলতেই মায়ের মুখখানা আবার কঠিন হয়ে উঠল।

নেড়ু এবার কাঁদ-কাঁদস্বরে বলল—“হ্যাঁগো হ্যাঁ! তা তো বলবেই। ঘরের বের তো হও না, কাজেই বাইরের কোন খবরও তো রাখ না।

তাইতেই তো কথায় কথায় কাঠের চেলা নিয়ে মারতে আস। ডাকঘরে খাম ফুরিয়ে গিয়েছিল যে! মাষ্টারবাবু বললেন, 'নেড়ু, একটু দেরী হবে বাবা—খাম ফুরিয়ে গেছে। ভিতরে তৈরী হচ্ছে। একটু বস—একেবারে টাট্‌কা তৈরী খাম নিয়ে যাবে।'—তাইতেই তো আমি সেখানে ব'সে রইলাম। যেইমাত্র খাম তৈরী হয়ে এল—অমনি গরম গরম একখানা কলাপাতায় জড়িয়ে নিয়েই ছুটতে ছুটতে আসছি। তাইতেই তো এত দেরী হল!" নেড়ুর মুখখানা যেন অভিমানে ফেটে পড়ছিল।

ছেলের কৈফিয়ৎ শুনে আর মুখের চোখের ভাবভঙ্গী দেখে মা তো হেসেই আকুল—রাগ কোথায় ভেসে গেল!

তারপর খাওয়া-দাওয়া সেরে নেড়ু লক্ষ্মীছেলের মত বই নিয়ে বসল। কিন্তু পড়ায় তার মন বসল না। মায়ের কাছে মিথ্যা কথা ব'লে মনটা ভাল লাগছিল না; তা ছাড়া পুঁটেকে কথা দিয়েছে কাল দুপুরে আবার অঙ্ক শিখাতে যাবে। মায়ের

অনুমতি পাওয়া চাই। সারা বিকেলটাই তার মনটা খচ্খচ্ করতে লাগল।

রাত্রে মায়ের পাশে শুয়ে নেড়ু অনেকক্ষণ এপাশ ওপাশ ক'রে কাটাল। তারপর একবার মায়ের বুকে মুখ লুকিয়ে ডাকল—"মা!"

—"কি, বাবা ?"

—"একটা কথা বলব।—বল রাগ করবে না ?"

—"না রে, পাগল, না। কি বলবি বল না।"

—"আজ দুপুরে তোমার কাছে মিথ্যা কথা বলেছি। খাম আনতে সত্যি সত্যি কেন দেরী হয়েছিল জান ?"—তারপর একে একে দুপুরবেলার ঘটনাটা প্রকাশ ক'রে বলল—"মা, পুঁটে অঙ্কে বড়ো কাঁচা। আর সব বিষয়ে ও পাশ করবে নিশ্চয়ই—কেবল অঙ্কটাতেই ওর যা ভয়। অথচ একজন মাষ্টার রেখে যে পরীক্ষার আগে অঙ্কটা ঠিক ক'রে নেবে, সে পয়সাও ওদের নেই। প্রমোশন না পেলে হয়তো ওর আর পড়াই হবে না। তাই ও আমাকে ধরেছে এ ক'টা দিন দুপুরবেলাটা

ওকে আমি অঙ্ক বুঝিয়ে দিয়ে আসি। বল, তুমি মানা করবে না মা। আমার জন্যে তুমি কিচ্ছু ভেবো না মা। পাশ আমি নিশ্চয়ই করব—ফার্ষ্ট সেকেণ্ড না হয় না-ই হব।"

মায়ের মুখ হতে কোন উত্তর এল না বটে; কিন্তু দু'খানি স্নেহকোমল হাত নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরতেই নেড়ু বুঝল যে, মায়ের সম্মতি ও অজস্র আশীর্ব্বাদ সে পেয়েছে। সে পরম স্বস্তিতে মায়ের বুকে মুখ লুকিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

নন্দের সুমতি

সকালের সোনালি রোদ গাছের মাথায়—পাতায় পাতায় ঝিক্‌মিক্‌ ক'রে, সাদা হাল্‌কা মেঘের টুক্‌রাগুলো সুনীল আকাশে ছুটোছুটি ক'রে, ঘাসের বুকে শিশিরবিন্দুগুলো জ্বল্‌ জ্বল্‌ ক'রে, কাশের বন সাদা ফুলের বোঝা মাথায় নিয়ে হেলে-দুলে যেন সমস্বরে বলছে—'মায়ের আসবার আর দেরী নেই রে, তোরা সবাই উৎসবের জন্য তৈরী হ'।' ভিখারীর দল মায়ের আগমনী গান গেয়ে বেড়াচ্ছে। রাত পোহালেই গ্রামে গ্রামে ঢাকের বাদ্যের মহড়া শোনা যায়।

পূজো এসে পড়ল। শিশু-মহলে আনন্দের সাড়া পড়েছে। পূজোর মণ্ডপে তারা দারুণ কলরব জুড়ে দিয়েছে। কুমোরেরা কেউ দেবী-প্রতিমার অঙ্গে সযত্নে তুলির আঁচড় দিচ্ছে—কেউ বা সাজ পরাবার ব্যবস্থা করছে। অসুর না সিংহ—

কার তেজ বেশী, এই বিচার নিয়ে ছেলেদের মধ্যে তর্কের অন্ত নেই—এর মীমাংসা নিয়ে কোথায়ও ছোটখাট হাতাহাতি যে না হল এমন নয়! কার কেমন জামা-জুতা হবে, কে কি বাজি কিনবে—সে সব কথা নিয়েও তাদের মধ্যে তুমুল আলোচনা চলছে। কাঙ্গাল গরীবের মনে অন্য চিন্তার স্থান নেই—অন্ন-চিন্তাই সেখানে প্রবল; পূজোর ক'টা দিন পেট ভ'রে খেতে পাবে সেই আশার আনন্দ নিয়েই তারা মশগুল।

কাল পূজো। আজ কুমোরদের খাটুনীর অন্ত নেই, ভুঁইমালীরা পূজো-বাড়ীর উঠোন প্রভৃতি পরিষ্কারে ব্যস্ত। পাড়ার ছেলেদের সাথে নন্দদুলালও মণ্ডপঘরে নানা কথা নিয়ে কলরব জুড়ে দিয়েছে। সদু ঝি এসে ডাকল—"খোকাবাবু, মা ডাকছেন।"

"কেন?"—আড্ডাটা ত্যাগ ক'রে যেতে হবে, তাই তার বিরক্তি দেখা দিল

"পূজোর সওদা নিয়ে বাবু এইমাত্র বাড়ী এসে পৌঁছলেন—বোধ হয় তাই।"

অ্যাঁ! তবে চললাম ভাই!"—ব'লে, একছুটে নন্দদুলাল বাড়ীর ভিতর চ'লে গেল।

নন্দের বাবা বারান্দায় একখানা চেয়ারে ব'সে আছেন—গায়ের ঘাম তখনও শুকোয় নি; নন্দের মা পাখা হাতে তাঁকে বাতাস করছেন আর বাজার সম্বন্ধে একথা-ওকথা জিজ্ঞেস করছেন। সামনে রাশীকৃত জিনিসপত্র। বাড়ীতে পূজো—কাজেই সওদা কম নয়।

"বাবা, আমার পূজোর জামা-জুতা কই?"—ব'লে ছুটতে ছুটতে নন্দ সেখানে উপস্থিত হ'ল।

"এই যে নাও।"—ব'লে বাবা দুটি বাণ্ডিল তার হাতে দিলেন।

নন্দ পরম আগ্রহে জামার বাণ্ডিলটা খুলল। কিন্তু মুহূর্ত্তেই তার মুখের ভাব বদলে গেল। সে প্রবলবেগে মাথা নেড়ে ব'লে উঠল—"আমি এ জামা কিছুতেই গায় দেব না তো! কি বিশ্রী রং—আমি কি এখনও ছেলেমানুষ আছি যে, লাল টুক্‌টুকে জামা গায় দিতে হবে? সুধীনের বাবা

তার জন্যে কমলারঙের জামা এনেছেন। যার ইচ্ছে হয় সে পরুক গে—আমি কিছুতেই এটা পরব না।”

এই ব’লে রাগ ক’রে সে জামাটা ধূলোর মধ্যেই ছুঁড়ে ফেলল।

মা একটু হেসে বললেন—“তুই কি এরই মধ্যে বুড়ো হয়ে গেলিরে পাগলা ?”

বাবা বুঝিয়ে বললেন—“বাবা, এবার এ জামাটাই গায়ে দাও—আসছে বার তোমায় কমলা-

রঙের জামাই এনে দেব। রাত পোহালেই পূজো—এখন ও জামা বদলে আনার সময় নেই যে বাবা।”

মাও পিঠে-মাথায় হাত বুলিয়ে অনেক ক’রে বুঝালেন; কিন্তু নন্দ তার গোঁ ছাড়ল না—রাগে মুখখানা হাঁড়ির মত ক’রে দুপ্‌দাপ শব্দে পা ফেলে ঘর হতে বের হয়ে গেল।

মা পিছন থেকে ডাকলেন—“শোন্ শোন্, ওরে ক্ষ্যাপা ছেলে, শোন্—যাস্ নি, কথা শোন্। পিছুডাক অগ্রাহ্য করিস্ নি—ভাল হবে না।” কিন্তু নন্দ ততক্ষণে বাড়ীর সীমানা পার হয়ে গেছে।

বাবার মনটা দমে গেল—একটু রাগও হল; মলিনমুখে দুঃখ ক’রে বললেন—“ছেলেটা যে দিন দিন জেদী আর অবুঝ হয়ে চলল—এ তো ভাল লক্ষণ নয়!”

মাও মনে কম দুঃখ পান নি। কিন্তু সকল মায়েরই মনে যেমন একটা দৃঢ় ধারণা থাকে যে, ‘ছেলেকে তিনি চিনেন’—তেমনি ধারণা নিয়েই বললেন—“তুমি কিছু ভেবো না; হঠাৎ একটা

খেয়াল মাথায় চেপে বসেছে বই তো নয়! আমি বুঝিয়ে সুঝিয়ে সব ঠিক করব এখন। আর— পাঁচটা নয় সাতটা নয়, ঐ তো একটি মাত্র সন্তান— বয়সই বা কত? এই তো সবে দশ বছরে পা দিয়েছে। ও একটু বেশী আবদার করবেই তো!”

মা যা সহজ ভেবেছিলেন কাজের বেলা তা কিন্তু মোটেই সহজ হল না—ছেলের গোঁ তিনি কিছুতেই ভাঙ্গাতে পারলেন না। শেষে একটা বুদ্ধি করলেন—এক ফাঁকে ছেলের শোবার ঘরে নূতন জামা-জুতা রেখে এলেন। ভাবলেন—একলা ঘরে জিনিসগুলো নাড়াচাড়া করলেই রাগ না প'ড়ে যায় না।

পরদিন সকালে উঠে কিন্তু মা দেখেন—ছেলের দরজার বাইরে নূতন জামাটা এবং একপাটি জুতা গড়াগড়ি যাচ্ছে। একটু খোঁজাখুঁজি ক'রে অন্য-পাটিও নীচের উঠোনে পাওয়া গেল—শিশিরে ভিজে গেছে। বুঝলেন ছেলের রাগ এখনও পড়ে নি।

মায়ের মন সহজে দমে না! তিনি কাকেও

একথা জানালেন না। জামা-জুতা ঝেড়ে মুছে ঘরে নিয়ে রাখলেন—'আবার সাধলে খাব' এই প্রবাদ-বাক্যে বিশ্বাস ক'রে মনে মনে হাসলেন মাত্র।

সকাল হতেই পূজো-বাড়ীর ঢাকের বাদ্য সকলেরই, বিশেষ ক'রে, শিশুদের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য ও উচ্ছল আনন্দের সাড়া এনেছে। এই দিনটির জন্যই ছেলে-বুড়ো সবাই কি আগ্রহেই না দিন গণেছে! পাড়ার ছেলেমেয়ের দল নূতন পোষাক প'রে বুক ফুলিয়ে পূজো-প্রাঙ্গণে এদিক-সেদিক বেড়াচ্ছে—একে অন্যের জামা-জুতা পরীক্ষা ক'রে দেখছে; দু-একজন হয়তো একটু আড়ালে যেয়ে—কেউ না দেখে ফেলে এইভাবে তাড়াতাড়ি নূতন জুতাটা কোঁচা দিয়ে ঝেড়ে নিচ্ছে।

নন্দদুলাল আজ এদের মধ্যে নেই। দু'একবার তাকে এদিক-ওদিক সাধারণ-বেশে দেখা গিয়েছিল বটে, কিন্তু সেও ক্ষণিকের জন্য মাত্র। সে তার জেদ বজায় রেখেছে—নূতন পোষাক পরে নি।

পূজো-প্রাঙ্গণেরই এককোণে একটি বছর

সাতেকের ছেলে মলিন-মুখে অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে দাঁড়িয়ে ছিল। পরণে একখানি জীর্ণবস্ত্র—আধ-ময়লা। নিজের দীন পোষাকের সঙ্গে উপস্থিত ছেলেমেয়েদের উজ্জ্বল রঙচঙে পোষাকের তুলনা ক'রে চোখদুটি তার ছলছল করছিল।

সদু ঝি অল্প ক'দিন হয় নন্দদের বাড়ীতে এসেছে। বিশ্বাসী, কথা কয় কম—কাজ করে বেশী। যাতায়াতের পথে সে কয়েকবারই লক্ষ্য করেছে—ছেলেটি একভাবে দাঁড়িয়ে আছে। ছেলেটির মলিন মুখ আর ছল্‌ছলে চোখ তার সুপ্ত মাতৃহৃদয়ে বড়ই আঘাত করল। সে খানিকক্ষণ ছেলেটির মুখের দিকে তাকিয়ে রইল—কি একটু ভাবল—তারপর কাছে যেয়ে স্নেহ-কোমল-স্বরে জিজ্ঞেস করল—"খোকা, তুমি এখানে এমন মুখ ভার ক'রে দাঁড়িয়ে রয়েছ যে?"

ছেলেটি হঠাৎ থতমত খেয়ে গেল—সে কথার কোন উত্তর দিতে পারল না।

সদু আবার সস্নেহে জিজ্ঞেস করল—"তোমার

পূজোর কাপড় কৈ ? আজকের দিনে পুরাণো কাপড় পরেছ কেন ?”

এবার ছেলেটি উত্তর করল—“মার যে পয়সা নেই—আমায় নূতন কাপড় কিনে দেবে কেমন ক’রে ? তাই তো এই পুরাণো কাপড়খানা কেচে দিয়েছেন। দেখ না কত ছিঁড়ে গেছে।”—ব’লে সে ছলছল চোখে জীর্ণ কাপড়খানার দিকে চাইল। স্নেহের ছোঁয়াচ পেয়ে তার ভিতরের চাপা অভিমান বাইরে প্রকাশের রাস্তা পেল।

—“কেন তোমার বাবা কোথায় ?”

“বাবা বড্ড দুষ্টু—আমায় একটুও ভালবাসেন না। নইলে আমার জন্যে নূতন কাপড় নিয়ে আসে না কেন ? মাকে জিজ্ঞেস করলেই বলে—‘আসবে বই কি—বিদেশে চাকরী করে কিনা—ছুটি পেলে তো আসবে।’ বলে আর মা চোখ মোছে।” বলতে বলতে ছেলেটির ঠোঁটদুটি অভিমানে ফুলে উঠল।

সন্তু বুঝল, ছেলেটি পিতৃহীন। এই বাপমরা

ছেলেটির জন্য তার প্রাণটা সত্যই কেঁদে উঠল। সে অস্ফুটস্বরে ব'লে উঠল—"আহা!" তারপর অন্যান্য দু-চার কথার পর তার গায়ে হাত রেখে
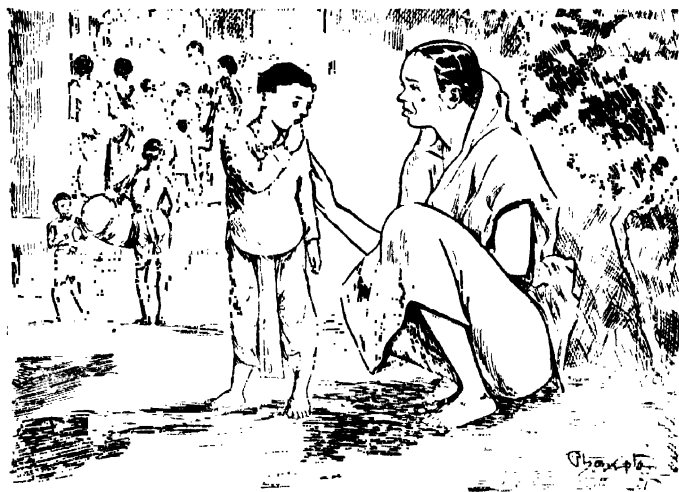
বলল—"তুমি বিকেলে এইখানেই এসে দাঁড়িয়ে থেকো—আবার আমার সঙ্গে দেখা হবে। কেমন, আসবে তো!"

ছেলেটি ঘাড় নেড়ে জানাল যে, সে আসবে। সদু আপন কাজে চ'লে গেল।

হারানো মাণিক

সন্ধ্যা হয়-হয়। আরতি দেখবার জন্য দু-একজন ক'রে লোক জমা হচ্ছে। নন্দদুলালও বাইরে আসছিল—হঠাৎ তার চোখে পড়ল সদু ঝি একটি ছোট ছেকে নিয়ে চুপি চুপি নিজের ঘরে যেয়ে দরজা বন্ধ করল। ছেলেমানুষের মন, তার অত্যন্ত কৌতূহল হল—ব্যাপারটা কি দেখতে হবে।

নন্দ চুপি চুপি সদুর ঘরের পিছনদিকের জানালায় যেয়ে দাঁড়াল। জানালা খোলাই ছিল—ঘরে কেরোসিনের ডিবা জ্বলছিল, কাজেই ভিতরের দৃশ্য দেখতে কষ্ট হল না।

ছেলেটিকে কোলে বসিয়ে সদু তখন তাকে খাবার—বোধ হয় পূজোর প্রসাদ—খাওয়াতে খাওয়াতে জিজ্ঞেস করল—"এবেলা আসতে এত দেরী হল যে ঝুনু ?"

—"মা যে আসতে দিতে চায় না, বলে রাত হয়ে যাবে। আমি তাকে কত বুঝিয়ে ওবাড়ীর পরেশদা'র সঙ্গে এলাম। মা বড্ড ভীতু কিনা।"

ঝুনুকে জল খাইয়ে নূতন জামা-কাপড় পরাতে পরাতে কতবার যে সদুর চোখে জল এসে পড়ল তার ইয়ত্তা নেই! তারপর সে উঠে ভাঙ্গা সুটকেসের ভিতর হতে একটা ন্যাক্ড়ার পুঁটুলি নিয়ে এল। সেটা খুলতেই ভিতর হতে একজোড়া

পুরাণো জুতা বের হল। জুতাজোড়া সযত্নে কাপড় দিয়ে মুছে ছেলেটির পায়ে পরাতেই তা ঠিকমতই লেগে গেল। আনন্দের আতিশয্যে ছেলেটির

মুখ-চোখ যেন ফেটে পড়ছে! ভালমন্দের বিচার তো তার মনে নেই—নূতনত্বের আবেশেই তার মন ভরপূর।

মাথার চুলগুলো পাট ক'রে, ভিজা গামোছা দিয়ে মুখখানা মুছে, মনের মত ক'রে কপালে একটি টিপ্ এঁকে সদু খানিকক্ষণ ঝুনুর মুখের দিকে অপলকনেত্রে চেয়ে রইল—তারপর হঠাৎ তাকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে ফুপিয়ে কেঁদে উঠল। বেঁচে থাকলে তার 'সতু'ও তো এমনটিই হত, সতুর বাবা আর সে দুইজনে এমনি ক'রেই পূজোর দিনে তাকে সাজাত। নিষ্ঠুর নিয়তি একসঙ্গে স্বামী আর পুত্রকে তার কাছ হতে ছিনিয়ে নিয়েছে—সে তো এই সেদিনের কথা। নইলে আজ তাকে পরের বাড়ী গতর খাটিয়ে খেতে হবে কেন?

নিজেকে একটু সামলে নিয়ে সদু হতভম্ব ঝুনুর মুখখানা নিজের গালের উপর চেপে ধ'রে মৃদুকণ্ঠে বলল—"একবারটি আমায় মা ব'লে ডাক, ঝুনু!"

বিনা আপত্তিতে ঝুনু ডাকল—"মা!"

—"আর একবার—আর একবার ডাক।"

—"মা!"

—"আর একবারটি—শুধু আর একবারটি!"

—"মা!"

সন্তুর সর্ব্বশরীর যেন থেকে থেকে শিউরে উঠতে লাগল—হাত-পা শিথিল হয়ে আসতে লাগল—ঝর্‌ঝর্ ক'রে গাল বেয়ে অশ্রুধারা পড়তে লাগল। কতদিন পরে—আঃ-কি তৃপ্তি!!

নূতন জামা-কাপড় পেয়ে ঝুনুর মন বাইরে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। সে এই অবসরে সন্তুর হাত ছাড়িয়ে পালাবার চেষ্টা করছিল। তার মনের ভাব বুঝতে পেরে সন্তু ঝুনুর পকেটে দু'আনার পয়সা দিয়ে "বাজি কিনিস্ বাবা" ব'লে তাকে মুক্তি দিল।

ঝুনু অবাক হয়ে ক্ষণিকের জন্য পকেটটা বাজিয়ে দেখল, তারপর পকেটে হাত দিয়ে, চেপে ধ'রে নাচতে নাচতে বাইরের দিকে ছুট্ দিল।

নন্দদুলাল বাইরে দাঁড়িয়ে এই অদ্ভুত দৃশ্য

আগাগোড়া দেখল। সন্তু ঝি এই জন্যই আজ সকালে মায়ের কাছ হতে একটা টাকা চেয়ে নিয়েছে! তার চোখ জ্বালা ক'রে জল বের হল—মনে তার অনুতাপ এল। একটা পরের ছেলেকে সাজাতে পেরে সন্তুর আজ এত আনন্দ—নিজের ছেলেকে সাজাতে বাপ-মায়ের মনে কত আনন্দই না জানি হয়। অতি সামান্য পোষাক প'রে ঐ ছেলেটির আজ আনন্দের সীমা নেই—আর অতি মূল্যবান সিল্কের পোষাকেও তার মন উঠে নি, এর জন্য বাপমার মনে সে কত কষ্টই না জানি দিয়েছে! অনুশোচনায় তার মনটা ভ'রে গেল। আর না—আজ হতেই সে অন্যায় খেয়াল—অসঙ্গত জেদ পরিত্যাগ করবে। মা-বাপকে সে সুখী করবে—তাঁদের স্নেহের মর্য্যাদা সে কিছুতেই নষ্ট হতে দেবে না!

সেখান হতে ফিরে নন্দ চুপি চুপি মায়ের ঘরের দিকে গেল। ঘরে তখন কেউই ছিল না। তাড়াতাড়ি টেবিলের উপর হতে জামা-জুতার

বাক্স দুটি নিয়েই সে দ্রুতপদে নিজের ঘরে ঢুকে দরজায় খিল লাগিয়ে দিল।

পনের-বিশ মিনিট পরে দরজা খুলে বাইরে গলাটা বাড়িয়ে দেখল—কাছে কেউ নেই। সে তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে অদৃশ্য হয়ে গেল। সে নূতন জামা-জুতা প'রে বের হয়েছে। তার সব চেয়ে বেশী লজ্জা হচ্ছিল—প্রথমেই যদি মায়ের সামনে প'ড়ে যায়! তাই সে দ্রুত পালিয়ে গেল। সঙ্গীদের সাথে মিশে প্রথম লজ্জার ভাবটা সে কাটিয়ে নিতে চায়।

মা কিন্তু পিছন হতে ছেলের কাণ্ড দেখে ফেলেছিলেন। ছেলের মনের ভাব বুঝে তিনি ডাক দিলেন না—কেবল একটু মুচকি হাসলেন।

আরতি শেষ হল—সকলেই ভক্তি-ভরে বিশ্ব-জননীর চরণোদ্দেশে প্রণাম করল। নন্দদুলালও প্রণাম ক'রে মনে মনে প্রার্থনা করতে লাগল—"মা দুর্গা, আমার মনটা ভাল ক'রে দাও মা—আমার রাগ জেদ দূর ক'রে দাও; মা-বাবার মনে

বাক্স দুটি নিয়েই সে দ্রুতপদে নিজের ঘরে ঢুকে দরজায় খিল লাগিয়ে দিল।

পনের-বিশ মিনিট পরে দরজা খুলে বাইরে গলাটা বাড়িয়ে দেখল—কাছে কেউ নেই। সে তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে অদৃশ্য হয়ে গেল। সে নূতন জামা-জুতা প'রে বের হয়েছে। তার সব চেয়ে বেশী লজ্জা হচ্ছিল—প্রথমেই যদি মায়ের সামনে প'ড়ে যায়! তাই সে দ্রুত পালিয়ে গেল। সঙ্গীদের সাথে মিশে প্রথম লজ্জ ভাবটা সে কাটিয়ে নিতে চায়।

মা কিন্তু পিছন হতে ছেলের কাণ্ড দেখে ফেলেছিলেন। ছেলের মনের ভাব বুঝে তিনি ডাক দিলেন না—কেবল একটু মুচকি হাসলেন।

আরতি শেষ হল—সকলেই ভক্তি-ভরে বিশ্ব-জননীর চরণোদ্দেশে প্রণাম করল। নন্দদুলালও প্রণাম ক'রে মনে মনে প্রার্থনা করতে লাগল—"মা দুর্গা, আমার মনটা ভাল ক'রে দাও মা—আমার রাগ জেদ দূর ক'রে দাও; মা-বাবার মনে

যেন আর কোনদিন কষ্ট না দেই—এই সুমতি দাও মা!”

এইভাবে সে কতক্ষণ যে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে ছিল বুঝে নি। মাথা উঠিয়ে ফিরতেই দেখে—মা আর বাবা সহাস্যমুখে তার পিছনে দাঁড়িয়ে!

সে নত হয়ে তাঁদের পায়ের ধূলি মাথায় নিল। মা সস্নেহে মাথায় হাত রেখে আশীর্ব্বাদ করলেন—শেষে হাত বাড়িয়ে তাকে বুকে তুলে নিলেন। আনন্দের আবেগে নন্দের চোখে জল এসে গেল!

পরশমণি

সেদিন ভোরবেলা বিছানায় 'আলিস্যি ভাঙতে ভাঙতে' বিন্দু হঠাৎ স্থির ক'রে ফেলল যে, আর দেরী করা চলে না—পড়াশুনোটা আবার একটু মন দিয়েই সুরু করতে হয়। সামনেই পরীক্ষা আসছে ; পরীক্ষার পরই পূজোর ছুটি !

সবে ভূগোলটায় একটু মন লেগে এসেছে—অমনি এক বাধা ! মা ঘরে ঢুকে ডাকলেন—"বিন্দু !" সংকাজে এমনি প্রতিপদে বাধা এসে উপস্থিত হয়—একথা বিন্দু—ভাগ্যিস্ বইয়ে পড়েছিল, তাই চট্ ক'রে রাগটাকে চেপে বইয়ের দিকে চোখ রেখেই উত্তর দিল—"কেন ?"

—"একবারটি দোকানে না গেলে তো চলে না, বাবা। চিন্নুর জন্যে এক কৌটো বার্লি এনে দে।"

মায়ের দিকে ফিরে গম্ভীরস্বরে বিন্দু উত্তর দিল—"এখন সময় হবে না।"

—"এক দৌড়ে যাবি, আর আসবি। নে, ওঠ। আর জ্বালাস্ নে বিনু।"

—"বলছি তো পড়ার সময় বিরক্ত ক'রো না। আমি পরীক্ষায় ফেল করলেই কি তোমরা খুশী
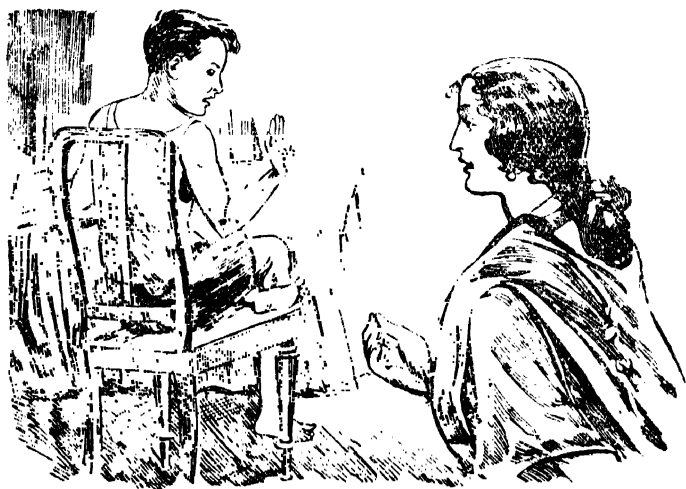
হও? আমি এখন যেতে পারব না—সোজা কথা। যাও, বিরক্ত ক'রো না।"

—"কচি বোনটা এত বেলা পর্য্যন্ত পথ্যি না ক'রে থাকবে? তোর প্রাণে কি একটুকুও দয়া-মায়া নেই রে!—একেবারে পাষাণ!"

বিনু এবার তেড়ে উঠল—"হ্যাঁ গো হ্যাঁ। আমি পাষাণ—আমি গারো হিল্‌স্‌—আমি বিন্ধ্যাচল—আমি দি গ্রেট হিমালয়াজ্‌! কেমন, এইবার হয়েছে তো?—এখন স'রে পড়। পড়া-শুনোর বেলা ওসব মায়া-দয়ার ভাবনা ভাবতে গেলে পরীক্ষায় বড় বড় গোল্লা ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায় না—সে খবর রাখ?"

ছেলের কথা আর ভঙ্গিতে মা প্রথমটা অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন। তারপর, "খুব যে বড় বড় কথা শিখেছিস হতভাগা! লেখাপড়া শিখছে না, দিনকে দিন বাঁদর হচ্ছে!" বলতে বলতে রেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। বিনু আবার নূতন ক'রে ভূগোলে মনোনিবেশ করবার চেষ্টা করতে লাগল।

কয়েক মিনিট যেতে না যেতেই মিনু ঘরে ঢুকে ডাকল—"দাদা!"

"কিরে মিনু—ওকি মুখখানা ভার কেন রে? কি হয়েছে?" বলতে বলতে বিনু বই বন্ধ ক'রে

বোনটিকে কাছে টেনে নিল। বলা বাহুল্য—এবার আর পড়ায় কোন ব্যাঘাত হল ব'লে কোন অভিযোগ উঠল না।

"দাদা গো, 'বুবু'র বড্ডো জ্বর হয়েছে; এই দেখ না—গা যেন পুড়ে যাচ্ছে।" ব'লে মিনু তার ডল পুতুলটা দাদার কোলের উপর রাখল। চোখেমুখে তার দারুণ উদ্বেগের ছায়া ঘনিয়ে এসেছে।

মিনুর এই পাকা গিন্নীর মত কথা শুনে বিনুর যা হাসি পায়! কিন্তু হাসবার কি যো আছে?—ভাগ্নে বাবাজির এমন দারুণ অসুখ—এটা কি একটা হাসবার সময়? ব্যাপারটা বুঝতে বিনুর বিশেষ কষ্ট হয় নি। ছাদের উপর রোদে প'ড়ে থেকে আলুর পুতুল বেজায় গরম হয়ে উঠেছে আর কি! যাই হোক, মুখখানাতে যথাসম্ভব গাম্ভীর্য্য ও উদ্বেগের ভাব ফুটিয়ে তুলে বিনু ভাগ্নেকে পরীক্ষা করতে লেগে গেল। তারপর গলায় দরদ ও উৎকণ্ঠার আমেজ মিশিয়ে বলল—"তাই তো, মিনু—সত্যি

বেশ জ্বর হয়েছে তো—কাল কোন রকমে ঠাণ্ডা লেগেছে কি? দিনকাল ভাল না—একটু সাবধানে রাখতে হয় রে!—তা ভয় কিরে?—ও এখুনি সেরে উঠবে। দাঁড়া ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি।"

"তাই দাও দাদা! আমার যা ভয় লেগেছে!" —দাদার ডাক্তারিতে মিনুর বরাবরই খুব বিশ্বাস।

বিনু তাড়াতাড়ি বুবুকে বিছানায় শুইয়ে দিল; মাথায় জলপটি বসিয়ে বাতাস করতে লেগে গেল। আর মিনু ওর গায়ে হাত বুলোতে লাগল। আলুর পুতুল ঠাণ্ডা হল—মা ও মামার অক্লান্ত সেবায় সে অতি শীগ্‌গিরই সুস্থ হল—জ্বর ছেড়ে গেল। দুর্ভাবনার মেঘ কেটে গিয়ে মিনুর মুখে আবার হাসি ফুটে উঠল। সে ছেলেকে বুকে তুলে নিয়ে দাদার দিকে সকৃতজ্ঞদৃষ্টিতে চাইতে চাইতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

এইবার বিনু প্রাণ খুলে হাসতে পেল। এতক্ষণ হাসি চেপে রাখতে গিয়ে ওর পেট যেন ফুলে উঠেছিল আর কি!—অভিনয়টা খুবই চমৎকার

হয়েছে বলতেই হবে। মূল্যবান সময় অনেকটা ছেলেখেলায় নষ্ট হয়ে গেল বটে! তা যাক—তবু তো মিনুর মুখের হাসি ফিরিয়ে আনতে পেরেছে! এর চেয়ে বড় জিনিস কি আছে? মিনুর জন্যে না করতে পারে এমন কাজ বোধ হয় বিনুর নেই। বড় আদরের বোন মিনু।

অথচ অন্যত্র ওর দুষ্টামি আর অশান্তপনার অবধি ছিল না। দুষ্টামির নিত্য নূতন ফন্দি ওর মাথায় গজাত বেশ। এই তো সেদিন একটা ব্যাঙ হঠাৎ বুড়ো পণ্ডিতমশায়ের টেবিলের উপরই লাফিয়ে পড়েছিল—সে এক হৈ-চৈ ব্যাপার। পরে অবশ্য দেখা গেল যে, ওটা সত্যিকারের ব্যাঙ নয়—স্প্রীংএর খেলনা ব্যাঙ!

আর একদিনের কাণ্ড: কোথায় কিছু নেই, হঠাৎ বেঞ্চের তলায় চট্‌পটি ঘসে' ছেড়ে দিয়েছে! পণ্ডিতমশায়ের হুঙ্কারে 'পাষণ্ড' স্বীকারোক্তি করল বটে, কিন্তু ব্যাপারটা ওখানেই চাপা প'ড়ে গেল। হেডমাষ্টারের ছেলে যে!—

হারানো মাণিক

সেদিন নূতন মাষ্টার সরজিৎবাবু বিজ্ঞান পড়াচ্ছেন। তাপে জিনিসের আয়তন বাড়ে—আর ঠাণ্ডায় ছোট হয়ে যায়—নানা যন্ত্রপাতি, ছবি ইত্যাদির সাহায্যে তিনি এই বিষয়টা ছেলেদের বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। ছেলেরা খুব মন দিয়ে শুনে যাচ্ছে। সত্যি, চমৎকার পড়ান কিন্তু! নইলে বিনুর মত অশান্ত ছেলেও অমন অখণ্ড মনোযোগ দেয়?

পড়া জিজ্ঞাসার পালা আসতেই মাষ্টারমশায় ছেলেদের এক এক ক'রে প্রশ্ন করতে লাগলেন—ছেলেরা চটপট উত্তর দিতে লাগল। সরজিৎবাবু খুব খুশী হলেন—পরিশ্রম সার্থক! সবশেষে তিনি জিজ্ঞেস্ করলেন—"গরমে বাড়ে আর ঠাণ্ডায় কমে এর আর একটা উদাহরণ দাও দেখি তোমরা, বইয়ে যা আছে উত্তর তার বাইরে হওয়া চাই কিন্তু!"

সব চুপ—কেউ উত্তর খুঁজে পায় না—মাথা চুলকায় আর এ ওর মুখের দিকে তাকায়।

"আমি পারি স্যার্!" ব'লে বিনু উঠে দাঁড়াল। মাষ্টারমশায়ের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

—"বেশ, বেশ, বল।"

—"গ্রীষ্মকালে দারুণ গরমে দিনগুলো বেড়ে কত লম্বা হয়, আর শীতকালে ঠাণ্ডায় সেগুলো কত ছোট হয়ে যায়!"

উত্তর শুনে সরজিৎবাবু স্তব্ধ হয়ে গেলেন।

বিনু পরম উৎসাহে ব'লে চলল—"ওর চেয়েও ভাল উদাহরণ আছে স্যার,—আমাদের পাড়ার ভজহরিবাবু একবার ব্যবসায়ে খুব ফেঁপে উঠেন—টাকার গরমে বেড়ে তখন তাঁর ভুঁড়িটি বেশ নাদুস-নুদুস হয়েছিল। কিন্তু আজকাল বাজার মন্দা হওয়ায় তিনি একদম ঠাণ্ডা মেরে গেছেন, সেই ঠাণ্ডায় ভুঁড়িটাও চুপসে একেবারে পিঠে গিয়ে ঠেকেছে।"

সমস্ত ক্লাসময় একটা চাপা হাসির ঢেউ খেলে গেল। তারপর যা কাণ্ড হল তা ছেলেদের, বিশেষ ক'রে বিনুর, ধারণায়ও আসে নি। সবাই অবাক হয়ে দেখল—সরজিৎবাবু, কান ধ'রে বিনুকে একেবারে বেঞ্চির উপর দাঁড় করিয়ে

দিয়েছেন। হেডমাষ্টারের ছেলে ব'লে বিনু এতদিন মাষ্টারদের কড়া শাসন এড়িয়ে এসেছে—ধমকধামক মাঝেমধ্যে অবশ্যই খেয়েছে। কিন্তু আজ এ কি হল! বিনু রাগে ফুলতে লাগল। ক্লাসের পড়া কিন্তু আবার আগেকার মতই চলতে লাগল।

আজ যেন সবার অবাক হবারই পালা!

"বাঃ—বাঃ, বিনয়বাবুর প্রমোশন হয়েছে দেখতে পাচ্ছি!" সবাই চমকে দেখে দরজায় দাঁড়িয়ে হেডমাষ্টারমশায়—চোখদুটো বাঘের চোখের মত জ্বলছেঃ "তা হবেই তো, হেডমাষ্টারের ছেলে যে! বেশ বেশ—দেখে ভারী খুশী হলাম। ইস্কুলের ছুটির ঘণ্টা না পড়া পর্য্যন্ত এমনি উচ্চাসনেই থাক।" এই ব'লে তিনি গম্ভীরমুখে ক্লাস থেকে বেরিয়ে গেলেন।

বিনুর মাথাটা তখন তার বুকের উপর একেবারে যেন লুটিয়ে পড়েছে। রাগে অভিমানে চোখ ফেটে টস্‌টস্ ক'রে জল পড়ছে!—কিন্তু বিনু নিরুপায়—বাবা যে বাঘ!

"নাঃ—এইখান থেকেই বাড়ীকে নমস্কার—আর ওমুখো নয়।—যুদ্ধ! যুদ্ধ! হ্যাঁ, ঠিক হয়েছে। কত ছেলে তো যুদ্ধে যাচ্ছে—এই তো সেদিন কাগজে পড়ছিলাম মাত্র তেইশ বছর বয়সের একটি ভারতীয় ছেলে খুব ভাল যুদ্ধ ক'রে 'ভিক্টোরিয়া ক্রস' মেডেল পেয়েছে—আজ পৃথিবীময় তার নাম ছড়িয়ে পড়েছে। আমিও যুদ্ধে যাব—এমন চমৎকার যুদ্ধ করব যে, 'ভিক্টোরিয়া ক্রস' আমার বুকেও ঝুলতে থাকবে। পারব না?—খুব পারব—নিশ্চয়ই পারব! ঐ তো দেশে দেশে খবরের কাগজে আমার ছবি ছাপা হয়েছে—সবারই মুখে আমার কথা ঘুরে বেড়াচ্ছে! ওঃ কি আনন্দ! এবার সবাই বুঝুক বিনু কেমন ছেলে!...

ওঃ হো, আর একটা কথা তো এতক্ষণ মনেই হয় নি! এরোপ্লেন—এবার খুব মজা ক'রে এরোপ্লেনে চড়া যাবে। এরোপ্লেনে চ'ড়ে ইস্কুলের খেলার মাঠটায় কয়েক চক্কর দিতে হবে—সঙ্গে কিছু চকোলেট কিনে নেব—পটলা, সমীর, মণ্টু, তিনু

এরা সব যখন মাঠে খেলতে থাকবে তখন খুব নীচুতে নেমে চকোলেটগুলো ওদের মাঝে ছড়িয়ে দেব—ওরা সবাই অবাক হয়ে উপর দিকে চাইবে। আমি রুমাল উড়িয়ে ইসারা করব—ওঃ সে কি মজাটাই না হবে! কত দেশ-দেশান্তরের উপর দিয়ে উড়ে যাব—শত্রুসৈন্যের উপর বোমা ফেলব। বন্দুক ঘাড়ে ক'রে দেশের পর দেশ জয় ক'রে চলব। চারদিকে গুলি-গোলা ফাটবে। ভয় পাব? দূর্ পাগল! বিনু অত ভয় পাওয়ার ছেলে নয়। নির্ভয়ে সমানে এগিয়ে যাব।...

হ্যাঁ, আর এক কথা—সাবমেরিনটায়ও একবার চ'ড়ে জলের ভিতর ঘুরে বেড়িয়ে আসতে হবে—ওটার রহস্যটা এবার আবিষ্কার করা যাবে। যুদ্ধ থেকে ফিরে যখন হঠাৎ বাড়ী এসে হাজির হব, সবার আগে মিনু দৌড়ে এসে...তাই তো, মিনুটার জন্যে ভারী মন খারাপ করবে—আমি না থাকলে ওর চলবে কি ক'রে।...নাঃ, বাড়ীতে একবার যেতেই হবে—মিনুকে সব কথা বেশ ক'রে

বুঝিয়ে বলব। কয়েকটা দিন কি আর সে আমাকে ছেড়ে থাকতে পারবে না? মনটা খুব খারাপ হবে—তা আমারও তো হবে! বুঝিয়ে বললে কি আর বুঝবে না? ও খুব বুদ্ধিমতী, নিশ্চয়ই বুঝবে।…

ব্যস্—আর কার তোয়াক্কা করি—মিনুর জন্যেই যা কিছু ভয় ছিল। যাক নিশ্চিন্ত।”—এমনি ধারা চিন্তায় বিনু এমনি তন্ময় হয়ে পড়েছিল যে, কোথা দিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেছে তার খেয়ালই হয় নি—হঠাৎ ছুটির কোলাহল কানে যেতেই তার চমক ভাঙ্গল। মনটা যেন অনেকটা হাল্কা হয়ে গেছে—সে সবার পাশ কাটিয়ে হন্‌হন্ ক'রে বাড়ীর দিকে চলল। আজকের ব্যাপারে ইস্কুলে ছাত্রমহলে তার যে 'পজিশান' ছিল তা নষ্ট হতে বসেছে। তা হোক—এখন এসব সে থোড়াই কেয়ার করে।

বাড়ীটা নীরব-নিস্তব্ধ! মিনুর কোন সাড়াশব্দ নেই। বিনু সোজা তার শোবার ঘরে ঢুকে

বই-খাতা টেবিলের উপর ছুঁড়ে ফেলে সটান বিছানায় গড়িয়ে পড়ল। 'আঃ কি আরাম! পা দুটো কোমরশুদ্ধ যেন ধ'রে গেছে অতক্ষণ বেঞ্চির উপর দাঁড়িয়ে থেকে।'...ইস্কুলের লাঞ্ছনার কথা আবার তার মনে ঘোরাফেরা করতে লাগল। শুয়ে শুয়ে সে ভাবতে লাগল—কালকে ইস্কুলে সে মুখ দেখাবে কেমন ক'রে! যুদ্ধের চিন্তা তখন তার মন থেকে মুছে গেছে। মাস্টারের সঙ্গে ফাজলামি করা যে খুবই অন্যায় সে-কথা ঠিক; কিন্তু সরজিৎবাবু তাকে বেঞ্চির উপর দাঁড় করিয়ে দিলেন কেন? তাইতেই তো বাবার চোখে প'ড়ে গেল। না হয় কয়েক ঘা বেতই মারতেন—সেও যে ছিল ভাল। ছিঃ ইস্কুলশুদ্ধ ছেলের দল তার এ শাস্তি চোখে দেখে গেল। অভিমান বিনুর বুকের ভিতর ঝড় বইয়ে দিতে লাগল। সে বালিশে মুখ গুঁজে প'ড়ে রইল।

—"দাদা! ও দাদা!"

মিনুর ডাকে বিনু ধড়মড়িয়ে বিছানায় উঠে বসল—চট ক'রে আঁচল দিয়ে মুখটা মুছে নিল।

বিনু কি কাঁদছিল ? হয়তো কাঁদছিল—অপমানের তীব্র জ্বালায়।

"দাদা, খুকুর চুলের ফিতে এনেছ ? দাও। কই ?—ওঃ আন নি! কি হবে ? কালকে যে গীতু আমার মেয়েকে দেখতে আসবে—তার ছেলের সঙ্গে বিয়ে হবে।—মেয়ের চুল বাঁধব কি দিয়ে ?" বলতে বলতে অভিমানে মিনুর ঠোঁট দুটি ফুলে' উঠল—চোখ দুটি ছল্‌ছল্ করে।

"ঐ যাঃ, বড্ডো ভুল হয়ে গেছে রে। কাল তো তোর মেয়ে দেখতে আসবে ? তা বেশ তো কাল—কাল খু-উ-ব সকালে এনে দেব নিশ্চয়ই। তোর মেয়ের ফিতে এনে তবে অন্য কাজ। আর দেখ, ভারি সুন্দর সুন্দর পুঁতির মালা দেখে এলাম—কত রঙবেরঙের। তাও তো কয়েকছড়া দরকার। খালি গায়ে মেয়ে বের করবি কেমন ক'রে রে ?" মিনুর সংস্পর্শে এসে ওর মনটা আবার তাজা হয়ে উঠে। অন্য সব কথা মন থেকে মুছে গেল।

"সত্যি বলছ দাদা ? রঙিন পুঁতির মালা ?

খুব সুন্দর মানাবে খুকুকে !"—মিনুর আনন্দ ধরে না। ওঃ, দাদার মত এমন ভাল মানুষ আর হয় না।—তবু—মিনুর হঠাৎ একটা কথা মনে প'ড়ে

গেল, বলল—"দাদা কাল থেকে যে তোমার মাষ্টার আসবে পড়াতে—শোন নি ?"

—"নাঃ। কে বললে রে ?"

—"বাবা বললেন। নূতন মাষ্টারমশাই যে এইমাত্র বাবার কাছে এসেছিলেন! মাষ্টারমশায় বলছিলেন—তোমার খুব বুদ্ধি, কিন্তু বড্ড দুষ্টামি কর।"

বিনু বুঝল সরজিৎবাবু এসেছিলেন। বুকটা দমে' গেল।

—"তারপর ?"

—"বাবা তো মায়ের কাছেও বলছিলেন—তুমি ইস্কুলে দুষ্টামি ক'রে আজ বাবার মুখে কালি দিয়েছ।—সত্যি ? মায়ের সামনে তোমাকে কত বকলেন। এবার পূজোয় আমরা সব্বাই বাড়ী যাব, তুমি যেতে পাবে না—মাষ্টারমশায়ের কাছে পড়তে হবে ;—শুনে আমার যা কান্না পাচ্ছিল।" সত্যি সত্যি, মিনুর গলা কেঁপে উঠল।

বিনুর বুকের মধ্যে তখন ঝড় বইছে। হঠাৎ দাদার গলাটা জড়িয়ে ধ'রে মিনতির স্বরে মিনু ব'লে উঠল—"দাদা, তুমি আর দুষ্টামি ক'রো না—আর

কক্ষণো বাবার মুখে কালি ছিটিয়ে দিয়ো না। তা নইলে ওরা তোমাকে মারবে যে। তখন কিন্তু আমি কেঁদে ফেলব।" বলতে বলতে মিনু সত্যই দাদার কোলে মুখ লুকিয়ে কেঁদে ফেলল।

বিনুও চোখের জল রাখতে পারল না। মিনুর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে ব'লে উঠল —"সত্যি বলছি মিনু, কাল থেকে আমি আর দুষ্টামি করব না—আমি ভাল হব। তুই যাতে মনে কষ্ট পাস্ তেমন কাজ কি আমি করতে পারি বোন? ছিঃ কেঁদো না লক্ষ্মী দিদি আমার।" বলতে বলতে বিনু নিজেও কেঁদে ফেলল। অনুতাপের অশ্রুতে ওর মনের ময়লা ধুয়ে মুছে গেল।—পরশমণির পরশে লোহা আজ সোনা হয়ে গেল!

দেবতার ডাক

সেই পূর্ণিমার রাত্রে গোপীনাথপুরের শ্যাম-সুন্দরের মন্দিরে মহা উৎসবের আয়োজন। ভুবন-ভুলানো শ্যাম-অঙ্গে বিচিত্র ফুলসাজ—ললাট সুগন্ধি চন্দনে চর্চ্চিত, শিরে শিখিচূড়া, গলে বনমালা, করে মোহন-বাঁশী, চরণে নূপুর—কালোরূপে মন্দির আলো ক'রে বঙ্কিমঠামে শ্যামসুন্দর বিরাজমান। ধূপ-গুগ্‌গুলের মনোহর সুগন্ধে মন্দিরের মধ্যে যেন কল্পলোকের সৃষ্টি হয়েছে। মনে হচ্ছিল—যেন দেব-অঙ্গের স্বর্গীয় সৌরভে মন্দিরের সর্ব্বপ্রকার অপবিত্রতা দূর হয়ে গেছে।

অগণিত ভক্তের দল হৃদয়ে অকৃত্রিম ভক্তির অঞ্জলি নিয়ে দেবতার চরণতলে উপস্থিত। একদিন যে বাঁশীর সুরে ব্রজবাসী পাগল হয়েছিল—যমুনা উজান বয়েছিল—সেই বাঁশীর অশরীরী সুর বুঝি এদের কানেও পৌঁছেছে, এদেরও পাগল করেছে—ভক্তের ভক্তিস্রোতে উজান বইয়ে দিয়েছে!

রাধানগরের সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্য্যও সেদিন সেই মন্দির-প্রাঙ্গণে উপস্থিত। সিদ্ধেশ্বর দিব্য সুপুরুষ যুবক—দীর্ঘ সুগঠিত দেহ, আয়ত আঁখি ও কুঞ্চিত কেশদামের অধিকারী। তার পিতা চরণদাস বিদ্যারত্ন ছিলেন সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, পরম বৈষ্ণব। প্রৌঢ় বয়সে রাধামাধবের বহু আরাধনার ফলে তিনি সিদ্ধেশ্বরকে পুত্ররূপে পেয়েছেন ; কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে তাঁর ভাগ্যে সুখ মিলে নি—বহু শিক্ষা এবং শাসনেও সিদ্ধেশ্বর মানুষ হল না—অসৎ সঙ্গে মিশে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে গেল। শেষের দিনগুলোতে চরণদাস সর্ব্বদাই মনে মনে রাধামাধবের চরণে মাথা খুঁড়ে বলতেন—"ঠাকুর, এমন অমানুষ পুত্র তো আমি চাই নি। পুত্র যদি দিলেই প্রভু, তবে তাকে সুমতি দাও—তোমার চরণে তার অচলা ভক্তি দাও—তাকে মনুষ্যত্ব দাও।"

তাঁর সেই কাতর প্রার্থনা ভগবানের চরণমূলে পৌঁছল কিনা, তা জানবার পূর্ব্বেই, সামান্য কয়েক মাসের ব্যবধানে সপত্নীক চরণদাস তাঁর

চিরবাঞ্ছিত রাধামাধবের রাতুল চরণে আশ্রয় নিলেন —যুবক সিদ্ধেশ্বরকে দিয়ে গেলেন স্বোপার্জ্জিত কিছু দেবোত্তর সম্পত্তি আর চির মুক্তি—হয়ত বা মানুষ হবার প্রচুর অবসরও।

দেবতার প্রতি ভক্তি-বিশ্বাসের বালাই সিদ্ধে-শ্বরের কোন দিনই নেই। সেদিন কখন, কেমন ক'রে, ঘুরতে ঘুরতে সে যে শ্যামসুন্দরের মন্দিরে যেয়ে উপস্থিত হল, তা সে নিজেও বুঝতে পারে নি। তাকেও শ্যামের বাঁশী ডাক দিয়েছিল কিনা কে জানে!

মন্দিরের বৃদ্ধ পুরোহিত বৃন্দাবন ঠাকুর আজ বড় ব্যস্ত। একা সমস্ত আয়োজন করতে হচ্ছে। তাঁর একমাত্র সন্তান, কিশোরী কৃষ্ণপ্রিয়া আজ চঞ্চল চরণে, নিপুণ হস্তে তাঁর সাহায্যের জন্য উপস্থিত নেই—ক'দিন হল গ্রামান্তরে গিয়েছে বিশেষ প্রয়োজনে।

মহাসমারোহে আরতি ও কীর্ত্তন সহকারে উৎসব যখন শেষ হল—তখন বেশ রাত হয়েছে।

একে একে ভক্তেরা রসতৃপ্ত অন্তরে মন্দির ত্যাগ করলেন—মন্দির-প্রাঙ্গণ জনশূন্য হল। সিদ্ধেশ্বর তখনও একই ভাবে ব'সে আছে—কে যেন তাকে জোর ক'রে বসিয়ে রেখেছে।

পূজারী ঠাকুর শ্যামসুন্দরের অঙ্গ হতে একে একে ফুলসাজ খুলে ফেললেন—ক্রমে বহুমূল্য রত্নাভরণভূষিত শ্যামসুন্দরের মূর্ত্তি প্রকাশ পেল। চঞ্চল দীপালোকে সেই রত্নালঙ্কারগুলো ঝক্‌ঝক্ ক'রে উঠল।

অলঙ্কারের সেই তীব্র দ্যুতি সিদ্ধেশ্বরের চোখ দুটোকে ধাঁধিয়ে দিল। তার মন হয়ে উঠল অত্যন্ত চঞ্চল—আঁখিতারা হয়ে উঠল অস্বাভাবিক উজ্জ্বল। মন্দির-প্রাঙ্গণ ছেড়ে সে চুপি চুপি পূজারীর অগোচরে মন্দিরমধ্যে প্রবেশ ক'রে এক অন্ধকার কোণে লুকিয়ে রইল। সরল-চিত্ত বৃদ্ধ পূজারীর মনে কোন সন্দেহের বা সংশয়ের স্থান ছিল না। বিশ বছর ধ'রে তিনি শ্যামসুন্দরের পূজক—মন্দিরে কোন দিন কোন দুর্ঘটনা ঘটে নি।

গভীর রাত্রি। চারিদিক নিস্তব্ধ—জনমানবের সাড়া নেই। বাইরে পূর্ণিমার চাঁদ মেঘ-বালাদের সাথে লুকোচুরি খেলছিলেন—ধরার বুকেও তাই চলছিল আলো-ছায়ার দোলা। চাঁদের দু-এক টুকরো আলো এসে পড়ছিল মন্দিরের ভিতরে। সেখানে জ্বলছিল একটি মাত্র ঘৃতের প্রদীপ। প্রদীপের ক্ষীণ আলোক-ধারায় সেখানেও একটা আলো-ছায়ার খেলা চলছিল। ধূপের মৃদু সুগন্ধ তখনও নিঃশেষে বাতাসে মিলিয়ে যায় নি।

সিদ্ধেশ্বর ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল, কিন্তু ঠাকুরের আসনের কাছে পৌঁছেই পলকহীন নেত্রে শ্যামসুন্দরের অপরূপ মূর্ত্তির পানে চেয়ে রইল। ঠাকুরের পায়ে তখনও মণিখচিত নূপুর—গলে সোনার ফুলে তৈরী মালা—কর্ণে মণিময় কুণ্ডল—শিরে হীরকমণ্ডিত শিখি-পুচ্ছ-শোভিত মুকুট—করে বিবিধ রত্ন-শোভিত বাঁশীটি!—কম্পিত দীপশিখার আলোকে সেগুলো থেকে থেকে জ্বল্-জ্বল্ ক'রে উঠছিল!—সিদ্ধেশ্বরের চেতনা ক্রমশঃ যেন বিলুপ্ত

হয়ে আসছিল—কিন্তু তার দৃষ্টি হয়ে আসছিল লোলুপ। সে কম্পিত হস্তে ঠাকুরের মাথার মুকুটটি, হাতের বাঁশীটি ও গলার মালাটি তুলে নিল —ঠিক সেই সময়েই মেঘ স'রে গিয়ে সেই মুহূর্ত্তের জন্য এক ঝলক জ্যোৎস্না এসে শ্যামসুন্দরের মুখের উপর পড়ল ; সিদ্ধেশ্বরের মনে হল যেন ঠাকুরের নীল আয়ত আঁখি দুটি স্নিগ্ধ হাসির আভায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে—তাঁর রক্তিম ওষ্ঠের কোণে মধুর হাসির রেখা ফুটে উঠেছে। সিদ্ধেশ্বরের হৃদয় দুলে উঠল—তার কম্পিত হস্ত হতে অলঙ্কারগুলো মেঝেয় প'ড়ে গেল—দু'হাতে মুখ ঢেকে সে দূরে স'রে দাঁড়াল।

কিন্তু সে ক্ষণিকের জন্য মাত্র। পরমুহূর্ত্তেই হৃদয়ের সমস্ত শক্তি একত্রিত ক'রে সিদ্ধেশ্বর এগিয়ে গেল—তারপর মেঝে থেকে অলঙ্কারগুলো তুলে নিয়ে, দ্রুত ও সতর্কভাবে দুয়ার খুলে মন্দির হতে বেরিয়ে গেল।

নিরালা মাঠের পথে চলতে চলতে মাঝে মাঝে

তার মনে হতে লাগল—যেন সুমধুর বাঁশীর সুর ও মৃদু নূপুরের ধ্বনি পেছন থেকে এসে তার কানে বাজছে! সে দু-একবার থমকে দাঁড়িয়ে পেছন ফিরে চাইল—কিন্তু জ্যোৎস্না-ধৌত উন্মুক্ত প্রান্তরে বহুদূর পর্য্যন্ত কিছুই তার দৃষ্টিগোচর হল না। মনের দুর্ব্বলতা ভেবে সিদ্ধেশ্বর দৃঢ়-পদক্ষেপে আবার সামনের দিকে এগিয়ে চলল।

বাকি রাতটুকু সিদ্ধেশ্বরের ঘুম হল না। নিদ্রার আবেশে চোখের পাতা বুজে আসে—অমনি তার চোখের সামনে ফুটে উঠে মন্দিরের সেই শ্যামসুন্দর মূর্ত্তি—সিদ্ধেশ্বর চমকে চোখ মেলে চায়। এমনি ক'রে সেই রাত্রিটুকুতে বঙ্কিম শ্যামরূপ সিদ্ধেশ্বরের স্বপনপুরে আনাগোনা করলেন। সিদ্ধেশ্বর মনে মনে স্থির করল—আর শ্যামসুন্দরের মন্দিরের পথে পা বাড়াবে না।

কিন্তু পরদিন সন্ধ্যা হতে না হতেই কি একটা অদৃশ্য শক্তি তাকে প্রবলভাবে মন্দিরের দিকে আকর্ষণ করতে লাগল। সিদ্ধেশ্বর প্রাণপণে সে

অদৃশ্য শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ক'রে শ্রান্ত হল। অবশেষে ঘরে ঘরে সন্ধ্যাদীপ জ্বলার ও শঙ্খধ্বনির সাথে সাথেই সে মন্দিরের পথে যাত্রা করল।

মন্দির-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয়ে ভয়-ব্যাকুল-দৃষ্টিতে ঠাকুরের দিকে চেয়ে সিদ্ধেশ্বর যা দেখলে তাতে তার শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল—বুকের ভিতর থেকে একটা সুগভীর স্বস্তির নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল।—

ঐতো মোহনরূপে মন্দির আলো ক'রে মদনমোহন শ্যাম দাঁড়িয়ে আছেন। মুখে মধুর হাস্যচ্ছটা—মাথায় সেই মুকুট, হাতে সেই বাঁশীটি—সেই মালাটি বুকের 'পরে দুলছে। সিদ্ধেশ্বর ভেবে ঠিক পেল না এ রকমটা কেমন ক'রে হল!—এই তো গতরাত্রেই সে নিজহাতে ঐ অলঙ্কারগুলো সরিয়ে নিয়ে গেছে!—তবে কি এসব ঐ গোপালেরই কোন কারসাজি?—ভয়ে, বিস্ময়ে ও আনন্দে সিদ্ধেশ্বর অভিভূত হয়ে পড়ল—চোখের কোণ বেয়ে মুক্তার মত অশ্রুর পর অশ্রুবিন্দু ঝ'রে পড়ল!

সে নিজের অজ্ঞাতে ভক্তিভরে ঠাকুরের উদ্দেশ্যে মাথা নোয়াল।

সে-রাত্রে সিদ্ধেশ্বর দেখল—মন্দিরের গোপালের হাত ধ'রে এক অপরূপ সুন্দরী কিশোরী তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। গোপালের মাথায় মুকুট নেই, হাতে বাঁশী নেই, গলায় মালা নেই। মেয়েটি জলভরা চোখে, ব্যাকুলভাবে বলছে—"ওগো, ফিরিয়ে দাও, আমার প্রাণের গোপালের মোহনচূড়া, মোহন বাঁশী আর মোহন মালাটি! আমার মন্দিরে আজ যে আর শ্যামের পরিপূর্ণ রূপ দেখতে পাই না—বাঁশীর সে প্রাণ-আকুল-করা সুর আজ যে নীরব হয়ে গেছে। আমি কেমন ক'রে বেঁচে থাকব? ওগো, তোমার দুটি পায়ে পড়ি—দাও, গোপালের আভরণগুলো ফিরিয়ে দাও; আমায় বাঁচাও—আমি চিরজীবন তোমার দাসত্ব করব।"

...সিদ্ধেশ্বর ধড়মড়িয়ে জেগে উঠে দেখে—ঘর শূন্য, নিস্তব্ধ; কেবল তার নিজেরই চাপা একটা কান্নার সুর ভেসে বেড়াচ্ছে—আর চোখের জলে বালিশ

ভিজে গেছে। তাঁর সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল —সে আবার শিশুর মত ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

... ...

এদিকে গ্রামান্তরে গিয়ে কৃষ্ণপ্রিয়ার মনে আনন্দ নেই—শ্যামসুন্দরকে ছেড়ে থাকা তার পক্ষে বড়ই কষ্টকর। একদিন রাত্রে কৃষ্ণপ্রিয়া স্বপ্ন দেখল—অতি সুন্দর একটি যুবকের হাত ধ'রে শ্যামসুন্দর তার কাছে এসে বলছেন—"আর কতদিন এখানে থাকবি? আমি ওখানে যে আর একলা থাকতে পারিনে; এই দেখ্ তাই কেমন একটি খেলার সাথী জুটিয়ে নিয়েছি! তুই শীগ্গির চ'লে আয়।"

গোপালের ডাক এসেছে—আর কি কৃষ্ণপ্রিয়া দূরে থাকতে পারে?—পরদিনই গোপীনাথপুর রওনা হল সে।

পাল্কী এসে যখন মন্দিরের দুয়ারে থামল—তখন বেশ রাত্রি হয়েছে। অন্যান্য দিনের ন্যায় আরতি শেষ হয়ে গেছে—শূন্য নাটমন্দিরের একপাশে সিদ্ধেশ্বর অপলকনেত্রে শ্যামসুন্দরের মূর্ত্তির পানে

চেয়ে ব'সে আছে—দু'নয়নে ধারায় ধারায় অশ্রু ঝ'রে পড়ছে।

কৃষ্ণপ্রিয়া দ্রুতপদে প্রাঙ্গণ পার হয়ে মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করল। গোপালের দিকে চোখ পড়তেই সে চীৎকার ক'রে ব'লে উঠল—"বাবা, বাবা, আমার গোপালের এ দুর্দ্দশা কেমন ক'রে হল? আমার শ্যামসুন্দরের মাথায় মুকুট কই—হাতে বাঁশী কই—গলায় মালা কই? আমি এ ক'দিন্ তাঁর সেবা করি নি ব'লেই কি আমার গোপাল অভিমানভরে মুকুট ত্যাগ করেছেন—বাঁশী ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন—গলার মালা ছিঁড়ে ফেলেছেন?"—সঙ্গে সঙ্গে সে কেঁদে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

কন্যার আর্ত্তনাদ-শব্দে বৃন্দাবন ঠাকুর ছুটে এলেন। কৃষ্ণপ্রিয়ার ভূলুণ্ঠিত দেহ কোলে তুলে, সকল কথা শুনে, অবাক হয়ে বললেন—"এ কি বলছিস পাগলী মা আমার?—ঐ তো তোর গোপালের মাথায় শিখিচূড়া, হাতে বাঁশী আর গলায়

বনমালা—সবই তো তেমনি আছে। ভাল ক'রে একবার চেয়ে দেখ মা!"

কিন্তু কৃষ্ণপ্রিয়ার কান্না আর থামে না—তার চোখে যে সত্যই ভাসছিল অপূর্ণ গোপালমূর্ত্তি!

বংশগত সংস্কার আর বিবেকের দারুণ দংশনে ক্ষতবিক্ষত হয়ে সিদ্ধেশ্বর সেদিন এসেছিল চুপে চুপে শ্যামসুন্দরের অলঙ্কারগুলো যথাস্থানে রেখে দিতে। এতক্ষণ সুযোগের অপেক্ষায় মন্দির-প্রাঙ্গণে ব'সে ছিল। কৃষ্ণপ্রিয়ার আর্ত্তনাদ-শব্দে চমকে উঠে সামনের দিকে তাকাতেই তার বিস্ময়ের আর অবধি রইল না—একি! গোপালের হাত ধ'রে স্বপ্নে দেখা দিয়েছিল তো ঐ মেয়েটিই! স্বপ্নে-দেখা মেয়েটি তবে পূজারী ঠাকুরেরই মেয়ে। একি অদ্ভুত অঘটন!

নাস্তিক সিদ্ধেশ্বরের হৃদয়ের সমস্ত আবর্জ্জনা এবার ধুয়ে মুছে গিয়ে সেখানে প্রতিষ্ঠিত হল শ্যামসুন্দরের দিব্যমূর্ত্তি। সে ছুটে মন্দিরের ভিতর প্রবেশ ক'রে শ্যামসুন্দরের পদতলে সেই

অলঙ্কারের পুটলীটি রেখে দিল, তারপর বৃন্দাবন ঠাকুরের চরণে লুটিয়ে প'ড়ে—ব্যাকুলভাবে কাঁদতে লাগল।

বৃন্দাবন ঠাকুর এই অতর্কিত ব্যাপারে প্রথমটা থতমত খেয়ে গিয়েছিলেন। পরে সিদ্ধেশ্বরকে হাত ধ'রে তুলে পাশে বসিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—"তুমি কে বাবা? এমন ক'রে কাঁদছই বা কেন?"

সান্ত্বনাবাক্যে প্রকৃতিস্থ হয়ে সিদ্ধেশ্বর একে একে সমস্ত ঘটনা—স্বপ্নবৃত্তান্তসহ বিবৃত করল।

শুনতে শুনতে বৃন্দাবন ঠাকুরের চোখও সজল হয়ে গেল—তিনি বাষ্পজড়িত-কণ্ঠে বললেন—"ভয় কি বাবা! কৃতকর্ম্মের জন্য আন্তরিক অনুতাপই তো পাপের পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত। অনুতাপের আগুনে তোমার মনের সকল ময়লা পুড়ে গেছে—তোমার অন্তর বিশুদ্ধ হয়েছে।—গোপালের দয়া তো তুমি পেয়েইছ বাবা—দেবতা যে তোমায় আপনি কাছে ডেকে নিয়েছেন।"

কৃষ্ণপ্রিয়াও এতক্ষণ অবাক হয়ে সিদ্ধেশ্বরের মুখের পানে চেয়ে ছিল—গোপাল তাকে স্বপ্নে যে খেলার সাথী জুটিয়ে দিয়েছিলেন সে যে ঐ সুন্দর যুবকটিই!—কৃষ্ণপ্রিয়ার চোখে নেমে এল অশ্রুর বন্যা। সে মনে মনে বলল—'গোপাল, গোপাল, এত দয়া তোমার এ ভক্তিহীনার প্রতি।'

"তোমাকে দেখে মনে হয় তুমি কোন সৎ-বংশের ছেলে—পরিচয় দিতে তোমার আপত্তি আছে কি?" —বৃন্দাবন ঠাকুর জিজ্ঞেস করলেন।

অশ্রুজলে ভাসতে ভাসতে সিদ্ধেশ্বর নিজের পরিচয় জানাল। তার সব পরিচয় পেয়ে বৃন্দাবন ঠাকুরের অন্তর খুশীতে ভ'রে উঠল; তিনি বললেন— "বাবা, আমার একটা অনুরোধ তোমায় রাখতে হবে। আমি বুড়ো হয়েছি—কবে শ্যামসুন্দর কৃপা ক'রে তাঁ'র শান্তিময় কোলে টেনে নেবেন—সেই বহু-আকাঙ্ক্ষিত দিনটির অপেক্ষায় ব'সে ব'সে দিন কাটিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু কোন উপযুক্ত পাত্রের হাতে আমার এই মা-টিকে তুলে দিয়ে না যেতে

পারলে তো আমি মরেও শান্তি পাব না। তুমি শেষজীবনে আমায় এই শান্তিটুকু দেবে কি বাবা ?"
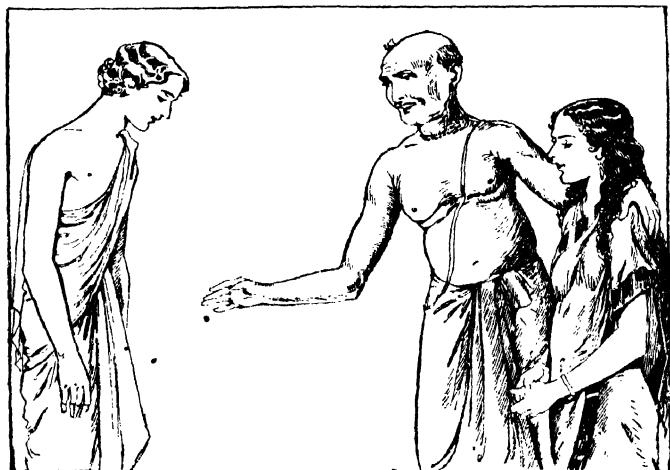
কথা শুনে, সিদ্ধেশ্বর নতশিরে দাঁড়িয়ে রইল।

... ...

সেই থেকে সস্ত্রীক সিদ্ধেশ্বর শ্যামসুন্দরের পূজক। কৃষ্ণপ্রিয়া নিপুণভাবে পূজোর সমস্ত আয়োজন ক'রে দেয়, আর সিদ্ধেশ্বর মনপ্রাণ ঢেলে শ্যামসুন্দরের পূজো করে।